যোগেন্দ্র-জীবনী।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক প্রণীত।

"মহত-চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে।
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার-নিলয়,
কালের সাগরতটে পদচিহ্ন চয়।"—লং ফেলো।

আন্দুল "আত্মোন্নতি সভা" হইতে
প্রকাশিত ও প্রচারিত।

কলিকাতা

৬১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, "দেব যন্ত্র" হইতে
শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল।

LIBRARY
21. DEC. 04

বিজ্ঞাপন।

আন্দুল উচ্চশ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের মৃত্যুর এই দশ বৎসর পরে, তাঁহার জীবন-চরিত সাধারণ পাঠকবর্গের সম্মুখে আনীত হইল। আমরা যে দিন দিন হীনাবস্থাপন্ন হইতেছি, নৈতিক শক্তির অভাবই তাহার প্রধান কারণ। সেই শক্তি সন্ধুক্ষিত করিতে হইলে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের জীবন গাথা প্রকাশিত করা নিতান্ত আবশ্যক। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আমরা এই জীবনীখানি লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যাঁহার স্বার্থ ত্যাগ ভগবদ্ভক্তি, ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ লোকসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, আজ আমরা সেই দেবচরিত্রের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও তাঁহার উদারতা আন্দুল ও তৎপার্শ্বস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয় মধ্যে প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর মালার ন্যায় অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি বহুবিধ ক্লেশ ও অপরিমিত পরিশ্রম সহকারে আন্দুল প্রভৃতি গ্রামের অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার অপনীত করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি আন্দুলে পাশ্চাত্য বিদ্যার বীজ বপন এবং অতি যত্নে ও অক্লিষ্ট আয়াসে তাহার পরিপালন ও সংরক্ষণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিদণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন। সেই সাধুচরিত্র মহাত্মার জীবনী সাধারণে প্রকাশিত না হইলে নিশ্চয়ই আন্দুলবাসী মাত্রেই প্রত্যবায়ভাগী হইতেন। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমাদের

ক্ষুদ্র চেষ্টার দ্বারা এই যে জীবনীখানি প্রকাশিত করিলাম, ইহাতে যোগেন্দ্রনাথের প্রকৃত চরিত্র বর্ণনা করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আন্দুলবাসী সহৃদয় পাঠকগণ বিচার করিবেন। তবে আমরা তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করি নাই। এই জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে অনেক বিষয় মৌখিক কথার উপর বিশ্বাস করিয়া লিখিত হইয়াছে। যোগেন্দ্রনাথের সমকালীন এখনও অনেক ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন; তাঁহারা এবং সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের কোন স্থলে কোনও ভ্রম বা দোষ দৃষ্টি করিলে আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবগত করাইলে তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব এবং সুবিধা হইলে বারান্তরে সংশোধনের চেষ্টাও করিব।

পরিশেষে আমরা জীবনীলিখিত স্বর্গীয় মহাত্মার অশেষ গুণবিশিষ্টা ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী শ্রীমতী অধরমণি মহোদয়াকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করি, কারণ তাঁহারই অশেষ যত্নে ও ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্যে আমরা ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জীবনীর পাণ্ডুলিপি বিশেষ যত্নের সহিত আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, সেই কারণ আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। আন্দুলনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনীর অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া আমাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিলাম। এইস্থলে আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ

কবিরত্নের নিকট সাহায্য পাইয়া তাঁহারও প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে জীবনীখানি জনসাধারণের প্রীতিকর ও পাঠকবর্গের কিয়ৎপরিমাণে উপকার সাধন করিলেই আমরা বিশেষ কৃতার্থ হই।

আন্দুল আত্মোন্নতি সভা।

আন্দুল।
১৪ই শ্রাবণ, ১৮১৬ শক।

শুদ্ধিপত্র।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৶০	১৭	রামস্মরণ	রামশরণ
২	৩	প্রসংশা	প্রশংসা
৪৯	৪	হইয়াছিলেন	করিয়াছিলেন
৬৯	১৬	তৎপ্রাকন্তর্ত্তী	তৎপ্রান্তবর্ত্তী
১৩৩	১২	পশ্চিম	পশ্চিম
১৫৮	১০	অগ্রহাতিশয়	আগ্রহাতিশয
১৭৯	৫	যামিনি	যামিনী
২৫৯	১৫	বিদ্যাধব	বিদ্যাধরী

৺ যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক।

উপক্রমণিকা।

গিরিরাজ হিমাচলের অত্যুন্নত শিখরে দণ্ডায়মান হইলে যতদূর দৃষ্টি যায় এবং যতদূর যায় না, সেই সুবিশাল ভারতভূমি এক সময়ে আর্য্যগণের সুখময় বিচরণক্ষেত্র ছিল। এই প্রাচীন-ভারতভূমির কীর্ত্তিকলাপ ও গৌরব-গরিমা চিন্তা করিতে গিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, এই ভারতভূমি অনেকগুলি ক্ষণ-জন্মা পুরুষের জন্মদান করিয়া জগতের তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছেন। এই ভারতের যে সকল ক্ষণজন্মা মহাত্মার কথা জগতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; যে সকল স্বাধীন আর্য্য মুনি-ঋষিগণ আপনাদের মহত্ত্ব ইতিহাসের প্রস্তরফলকে চিরখোদিত রাখিয়া গিয়াছেন; যে সকল ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ বেদগানে ভারতকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন; যে কবিগুরু বাল্মীকি এবং কবি-কুলতিলক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপনাদের অমৃতনিস্য-ন্দিনী বীণা-ঝঙ্কারে জগতকে চিরমুগ্ধ করিয়া

গিয়াছেন ; যে কপিল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রকার মুনি-গণ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের উপর স্বকীয় প্রভাবজাল বিস্তার করিতেছেন ; যে আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বিদ্যাবলে ভূলোক দ্যুলোক যে একসূত্রে আবদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যে জ্ঞানবৃদ্ধ বুদ্ধ, এবং প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ চৈতন্যদেব এই মরণ-ধর্ম্মশীল মর্ত্ত্যভূমিতে মহতী সাধনা প্রভাবে মনুষ্য-শক্তির অতীত অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। আমরা এক অতি ক্ষুদ্র জনপদের একটী উজ্জ্বল রত্নের কথা বলিতেছি। যাঁহার জীবনগাথা বলিতে যাইতেছি, তিনি বাল্যে সুখের তরঙ্গে ভাসিযাও দুঃখের কশাঘাতজনিত দারুণ কষ্ট জানিয়াছিলেন। তিনি আশৈশব পারিষদ্‌বর্গে বেষ্টিত থাকিলেও নিজ প্রকৃতির দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ত্রুটি করিতেন না।

হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই গ্রাম বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের আবাসস্থান ছিল। এই গ্রামে

৺গৌরচরণ মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে পিতামাতার কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া যৌবনোদ্গমেই তাহা হইতে বঞ্চিত হন; সুতরাং অভিভাবক-বিহীন হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কিছু কাল তথায় বাস করেন। শুনা যায়, ইনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন; ইহাঁর আর্থিক অবস্থা সামান্য গৃহস্থের অবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না। এই সময়ে ইনি হাবড়ার অন্তর্গত আন্দুলের প্রাচীনতম জমিদার ৺হরিশ্চন্দ্র দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপে কয়েক বিঘা জমি ও কয়েক খানি পর্ণকুটীর পাইয়া ঐ আন্দুলেই বাস করেন। বার্দ্ধক্যের অবলম্বন স্বরূপ ক্রমান্বয়ে তাঁহার ছয়টী পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রথম রামলোচন, দ্বিতীয় রামজয়, তৃতীয় রামসেবক, চতুর্থ রামতনু, পঞ্চম রামস্মরণ ও ষষ্ঠ নীলমণি। কাল-সহকারে ইহাঁরা সকলেই তৎকালপ্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক এক সম্ভ্রান্ত-বংশে বিবাহ করেন। প্রথম রামলোচনের বৃন্দাবন নামক

একটীমাত্র পুত্র সন্তান হয়। বৃন্দাবন মল্লিকের ঔরসে দুইটী মাত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমা কন্যার নাম বিমলা; কলিকাতাস্থ বহুবাজার নিবাসী সুবিখ্যাত দত্ত বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। সেই বিবাহের ফলে ৺ দুর্গাচরণ দত্তের সুশিক্ষিত পুত্র শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি এখনও জীবিত থাকিয়া আপনার যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছেন। দ্বিতীয়া কন্যা শিবসুন্দরী। কলিকাতার শ্যামবাজারস্থ রুদ্রবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ শ্রীনাথ রুদ্র অদ্যাপি জীবিত আছেন। আন্দুলের মল্লিকবংশের আদিপুরুষ গৌরচরণ মল্লিকের দ্বিতীয় পুত্র রামজয়ের ঔরসে ৺ কাশীনাথ মল্লিক জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইতে লাগিলেন। তিনি পৈতৃক বুদ্ধির অধিকারী হইয়া সকল বিষয়ই অতি সহজে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া অনেকে বলিতেন যে, কালে ইনি একজন উপযুক্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি

হইবেন ; বাস্তবিক সে অনুমান বৃথা হয় নাই। তিনি ক্রমে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও সকল বিষয়ে সাবধানতা দেখিয়া তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে কটক জেলার দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। ভাগ্যলক্ষ্মী যখন যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তখন সকল বিষয়ই তাঁহার অনুকূল হয়। ইহাঁর ভাগ্যেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইনি অনতিকালমধ্যে কোন একটী কার্য্যে তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া উক্ত গবর্ণর বাহাদুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ কটক জেলার কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়েন। ইনি উক্ত জেলার পুরীসহরে একটী প্রস্তরময় বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থান করিতেন ; অদ্যাবধি সে বাটীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের শাসনকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক বিলাত যাত্রা করিলে, কাশীনাথ বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সর্ব্বপ্রধান মোক্তারি পদে নিযুক্ত হন। এখানেও

তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ১৭৯৭ অব্দে যখন দ্বাজ-দামাহির সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ দশশালা নিয়মের অবতারণায় বিব্রত হইয়া স্বীয় কার্য্যে শৈথিল্য-বশতঃ মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর যখন জমিদা-রীর কতক অংশ হইতে অধিকারচ্যুত হন, সেই সময়ে কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও অশেষ পরিশ্রমে উক্ত জমিদারীর অধিকাংশ সিঙ্গুর নিবাসী ৺ দ্বারকানাথ সিংহ, ভাসতাড়া নিবাসী ছকু সিংহ, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় ও তেলিনিপাড়া নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নিকট হইতে অনেক কৌশলে আবার সংগ্রহ করেন। ইহাতে বর্দ্ধ-মানাধিপতি তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং পুরস্কার স্বরূপ হাবড়ার অন্তর্গত নবাবপুর মহলের অধিকাংশ ভূমি প্রদান করেন। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে, তৎসহ তাঁহার বেতনেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল।

কাশীনাথ মল্লিকের দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর নাম রামমণি, ইনি হাবড়ার অন্তর্গত অনন্তরাম-পুরের মিত্রবংশ-সম্ভূতা। ইহাঁর গর্ভে দুইটী

কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ১মা নবকুমারী, ২য়া উমাসুন্দরী। মুড়াগাছার অর্ণব বংশে উমাসুন্দরীর বিবাহ হয়; উমাসুন্দরীর গর্ভে কৃষ্ণকিশোর নামক এক পুত্র এবং সোণামণি ও বামাসুন্দরী নাম্নী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। সোণামণির গর্ভে ভোলানাথ ও পুলিনচন্দ্র নামক দুই পুত্র এবং কাদম্বিনী ও বিনোদিনী নাম্নী দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা বামাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র কেদারনাথ; ইনি অদ্যাবধি বর্ত্তমান। মহাত্মা কাশীনাথের দ্বিতীয় পত্নী কৃষ্ণমণি। কৃষ্ণমণির গর্ভে কাশীনাথ এক পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। কাশীনাথের পুত্র হইয়াছে শুনিয়া আন্দুলবাসী লোকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। অন্দর মহোৎসবময়, গ্রাম আনন্দময় ও পথসমূহ কোলাহলময় হইল। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশীনাথ বহুতর অধ্যাপক বিদায় ও বহুসংখ্যক অনাথ দরিদ্রগণকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন বিতরণ করেন।

কাশীনাথের পুত্র জগন্নাথপ্রসাদ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে বংশানুগত সদ্‌গুণের বিমলপ্রভা প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি অল্প বয়সেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন এবং কয়েকখানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ এবং কয়েকটী ভাবগর্ভ সঙ্গীত রচনা করিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নদীয়ার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের ৺রামমোহন মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে ক্রমান্বয়ে যোগেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও খগেন্দ্রনাথ নামক তিনটী পুত্র এবং কৈলাসকামিনী ও কৃষ্ণভাবিনী নাম্নী দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ অপুত্রকাবস্থায় লোকান্তর গমন করেন। দ্বিতীয় নগেন্দ্রনাথের যতীন্দ্রনাথ নামক একটী পুত্র এবং রাজবালা ও গিরিবালা নাম্নী দুইটী কন্যা হয়। যতীন্দ্রনাথ যশেন্দুবালা নাম্নী একটী কন্যা রাখিয়া অকালে লোকান্তর গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রনাথও দুইটী কন্যা সন্তান রাখিয়া অকালে কালকবলে পতিত হন।

বংশাবলী।

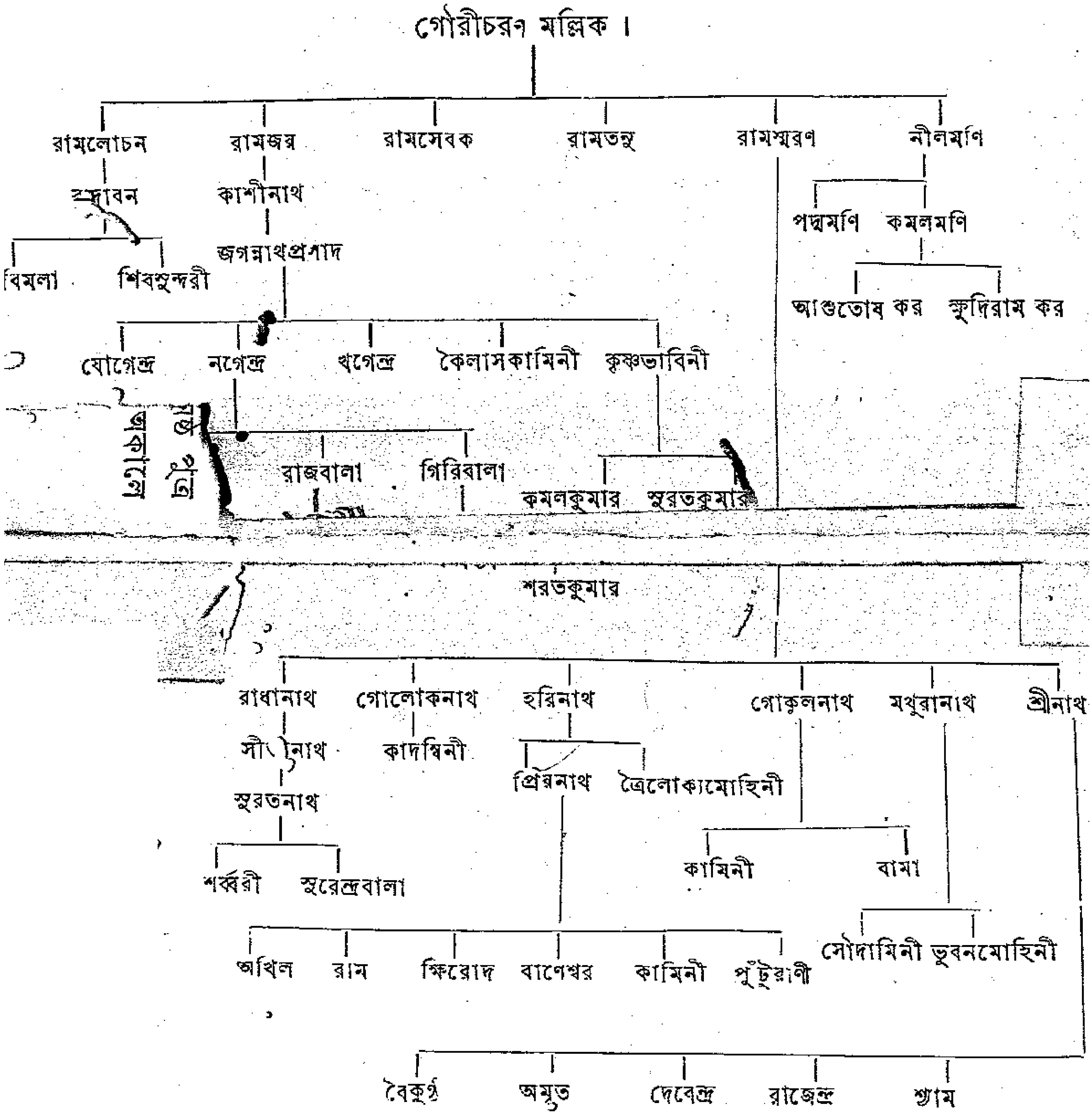
গৌরীচরণ মল্লিক।
রামলোচন
রামজয়
রামসেবক
রামতনু
রামস্মরণ
নীলমণি
বৃন্দাবন
কাশীনাথ
পদ্মমণি
কমলমণি
বিমলা
শিবসুন্দরী
জগন্নাথপ্রসাদ
আশুতোষ কর
ক্ষুদিরাম কর
যোগেন্দ্র
নগেন্দ্র
খগেন্দ্র
কৈলাসকামিনী
কৃষ্ণভাবিনী
রাজবালা
গিরিবালা
কমলকুমার
সুরতকুমার
শরতকুমার
রাধানাথ
গোলোকনাথ
হরিনাথ
গোকুলনাথ
মথুরানাথ
শ্রীনাথ
কাদম্বিনী
প্রিয়নাথ
ত্রৈলোক্যমোহিনী
সুরতনাথ
কামিনী
বামা
শর্ব্বরী
সুরেন্দ্রবালা
সৌদামিনী
ভুবনমোহিনী
অখিল
রাম
ক্ষিরোদ
বাণেশ্বর
কামিনী
পুঁটুরাণী
বৈকুণ্ঠ
অমৃত
দেবেন্দ্র
রাজেন্দ্র
শ্যাম

গৌরচরণের তৃতীয় পুত্র রামসেবক অপুত্রক ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রগণকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ ও যত্ন করিতেন। তিনি অতি অল্পবয়সেই বর্দ্ধমানাধিপতির অধীনে মোক্তারি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হন। তিনি যে কেবল আর্থিক উন্নতির দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন এমন নহে; তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ যাহাতে সৎকার্য্যে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ৺ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সদয় হৃদয়ের ও ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত বিগ্রহের কল্যাণে তথায় অনেক অনাথ দরিদ্র প্রতিপালিত হয়। তাঁহার অপরাপর কার্য্য সকলেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়, যে দরিদ্রবৃন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

স্বর্গীয় গৌরচরণের চতুর্থ পুত্র রামতনু অপু-
ক ছিলেন। তিনিও কৃতবিদ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী
য়া অল্পকাল মধ্যে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে অশ্রু-
ল ভাসাইয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ

করেন। পঞ্চম রামস্মরণের ঔরসে ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১ম রাধানাথ, ২য় গোলোকনাথ, ৩য় হরিনাথ, ৪র্থ গোকুলনাথ, ৫ম মথুরানাথ ও ৬ষ্ঠ শ্রীনাথ। গোষ্ঠীপতি মহাত্মা গৌরচরণের ষষ্ঠ পুত্র নীলমণির ঔরসে কেবলমাত্র দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা পদ্মমণি ও দ্বিতীয়া রামমণি নামে পরিচিতা। দ্বিতীয় কন্যার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ অধুনাতন রাজপুর-নিবাসী শ্রীমান্ আশুতোষ কর ও শ্রীমান ক্ষুদিরাম কর বর্ত্তমান।

যোগেন্দ্র-জীবনী।

প্রথম অধ্যায়।

যোগেন্দ্র বাবুর জন্ম—জগন্নাথ বাবুর জন্ম—শিক্ষা—চরিত্র—তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সকল হইতে উদ্ধৃত অংশ—তাঁহার রচিত সঙ্গীত ও সংস্কৃত শ্লোক—তাঁহার ধর্ম্মমত—শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র—স্বামীভক্তি—চরমাবস্থা।

সন ১২৩৯ সালে ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার আন্দুলের উজ্জ্বল রত্ন জামদার-কুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক কলিকাতার চারি ক্রোশ পশ্চিমে হাবড়ার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে কায়স্থ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ও মাতার নাম শ্যামাসুন্দরী। ইহাঁরা উভয়েই দয়ালুপ্রকৃতি ও আন্দুলবাসীর বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আন্দুলবাসী মাত্রেই

যোগেন্দ্র বাবুর পিতার স্বাভাবিক সরলতা, দেব-দ্বিজভক্তি ও পরোপকারিতাদি গুণনিচয়ের এবং তাঁহার মাতার প্রবল বুদ্ধিমত্তা ও অকৃত্রিম ধর্ম্ম-প্রাণতার ভূয়সী প্রসংশা করেন। জনক জননীর অনেক গুণ ও ভাব সন্তানে নামিয়া আইসে। ইতিহাসে অন্বেষণ করিলে ইহার বিস্তর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমরা যাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনিও তাঁহার পিতা মাতার বিষয়ের সঙ্গে তাঁহাদের সদ্গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইল যে, যোগেন্দ্র বাবুর পিতা জগন্নাথপ্রসাদ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরোপকারিতা, ন্যায়পরতা ও শিষ্টাচারিতা প্রভৃতি গুণে আন্দুল ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অধিকারীবৃন্দের ও সাধারণ প্রজা সমূহের বিশেষ প্রীতিভাজন ও সম্মানাস্পদ হইয়াছিলেন। প্রকৃতই তাঁহার সহিত যাঁহার একবার বাক্যালাপ হইত, তিনিই তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ধনাঢ্য লোকেরা প্রায়ই নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে যথেষ্ট আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ

হন না; কিন্তু তিনি সে প্রকার আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার কোন কার্য্যই ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিত না। তিনি আশৈশব মিতব্যয়িতা ও স্বাভাবিক সরলতা এই দুই পৈতৃক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার পঠদ্দশার একটী ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহার পাঠাগারে প্রদীপের বন্দোবস্ত ছিল; কিন্তু তাহা সামান্য বাতাসেই নিবিয়া গিয়া তাঁহার পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত করিত। একারণ একদিন তিনি তাঁহার পিতার নিকট গিয়া বলিলেন যে, "আমার পাঠকালীন প্রদীপ প্রায়ই নিবিয়া যায়, এজন্য একটা সেজের বন্দোবস্ত করিয়া দিন;" তাহাতে তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন যে, "তোমার লেখা পড়া কিছুই হইবে না। কারণ, যে ছেলে সেজ জ্বালিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে চাহে, সে মনে করে যে, সে বড় লোকের ছেলে। যে ছেলের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়, তাহার লেখা পড়া হওয়া দূরে থাকুক, সে একটী কুলপাংশুল হইয়া উঠে।" বাল্যকালে যে পুত্র পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ যথাযোগ্য শাসনের সহিত শিক্ষিত

হয়, সে পুত্র যে কালে একটী উজ্জ্বল রত্ন হইবে, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? জগন্নাথপ্রসাদও পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায়, অপরিমিত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের সহিত অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় সম্যক্ বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বঙ্গ-ভাষায় যে কয়খানি গ্রন্থ ও যে কয়টী কবিতা রচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি একজন স্থরুচিসম্পন্ন স্থন্দর লেখক ছিলেন। তাঁহার রচনায় যেরূপ ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ ও ধর্ম্ম ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাকে একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি "সত্যনারায়ণের কথা" "রামনবমীর ব্রত-কথা" "জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা" ও "সাবিত্রীর ব্রত-কথা" প্রভৃতি পুরাণাদি সংক্রান্ত ধর্ম্মকথা সকল এরূপ স্খলিতভাবে রচনা করিয়াছেন যে, যিনি একবার ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি আর কখন সে স্বাদ ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার "সঙ্গীত রসমাধুরী" নামক গ্রন্থখানি একবার প্রণি-ধান সহকারে দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহার

হৃদয় কিরূপ ভক্তি ও কিরূপ প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। পুস্তকখানির পরমাত্ম-বন্দনা অবধি শেষ পর্য্যন্ত সকল গানগুলিই ভক্তি ও প্রেমরসে রসান্বিত হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, উক্ত ভাষাতে কয়েকটী ভাবুকতাময় শ্লোক এবং "শব্দকল্পলতিকা" নামক সংস্কৃত ভাষার একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ সমাদর করিতেন। "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ইহা স্মরণ থাকিলে অন্যায় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বসিবার আসন, পানের ডিবা প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহে এক একটী উপদেশপ্রদ সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার একটী পানের ডিবায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত ছিল—

"অদ্য বাপি শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং।
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে॥"

ফলতঃ তিনি একজন ধার্ম্মিক বিদ্বান্ পরোপকারী সদাশয় ও প্রজাপ্রিয় জমিদার ছিলেন। তাঁহারই অত্যধিক যত্নে ও উৎসাহে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম জুরীপ্রথা প্রচলিত হয়। তিনি অনাথ-

দরিদ্রদিগকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া সন ১২৬৬ সালে লোকান্তর গমন করেন।

তাঁহার রচিত কয়েকটীমাত্র সঙ্গীত, সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া তাঁহার রচনাচাতুর্য্য অবগত হইতে পারিবেন।

গৌরী—তেতালা।

ভাব সেই পরাৎপরে জীবের জীবন, নমঃ অখিল নিকেতন ॥ধ্রু॥
কিবা মহিমা প্রভাব, সর্ব্বভূতে সমভাব বিভু বিশ্বের নয়ন ॥
অব্যয় অভয় নিরাময় নিরঞ্জন উপমারহিত সর্ব্বহিত, সনাতন।
তপন পবনগণ যাঁর বশে অনুক্ষণ নিয়ত করে ভ্রমণ ॥
জননীজঠর মধ্যে যখন সঞ্চার, তখন আহার দেন কিবা চমৎকার।
পরেতে ভূমিষ্ঠ হলে, রস রক্ত ক্লেদ স্থলে মধুর দুগ্ধ গঠন ॥

বাহার—জলদ তেতালা।

প্রপঞ্চ দেহ পঞ্চত্বে বিলম্ব কি আছে মন ॥ধ্রু॥
ক্ষণে অস্তি, ক্ষণে নাস্তি, জল-বুদ্বুদ্ যেমন ॥
দেখ কিবা চমৎকার, নিয়ম নাহিক তার,
কখন আসিবে কাল, গ্রাসিবে জীবে কখন ॥১
অপরূপ এবিধানে নিশ্চিত যে হত প্রাণ,
তাহে অনিশ্চিত জ্ঞান, অনিশ্চয়ে আকিঞ্চন ॥

না করিয়ে তত্ত্ব-তত্ত্ব, নিয়ত বিষয়ে মত্ত,
গুরুদত্ত পরমার্থ, পাশরিলে কি কারণ ॥
কিবা তব আশা বায়ু, এমন যে পরমায়ু,
তূর্ণ স্বর্ণ ভারার্পণে, নাহি দিলে অনুক্ষণ ॥
তাহা সুখে কর ক্ষয়, না ভাব কদা অব্যয়,
ভুলিয়েরে কাল-ভয়, ভাবিলে না নিরঞ্জন ॥৩॥

শিব-স্তোত্র।

শশাঙ্ক-শেখর, শঙ্কর, তরঙ্গ রঙ্কিত,
শম্ভু শুভঙ্কর, জয় মহেশ্বর ॥
ভব উরগকুণ্ডল, ভব পিশাচমণ্ডল,
ভব ব্যালবিকুন্তল, জয় স্মরহর ॥১॥
ভব ভুবনকারক, ভব ভুবনপালক,
ভব ভুবনঘাতক, জয় জাতজ্বর ॥
ভব শমননাশক, ভব শ্মশাননাটক,
ভব বিধানধারক, জয় জটাধর ॥২॥
ভব দেবাদিরঞ্জন, ভব পামরগঞ্জন,
ভব সত্য নিরঞ্জন, জয় জায়াবর ॥
ভব ভুজঙ্গভূষণ, ভব স্মরগভীষণ,
ভব দনুজনাশন, জয় পুরন্দর ॥৩॥
ভব অযোনিসম্ভব, ভব ভবাজ ভৈরব,
ভব গণেশশৈশব, জয় মহত্তর ॥০॥
ভব ধনাধিবান্ধব, ভব কপালবৈভব,
ভব একাঙ্গকেশব, জয় পরাৎপর ॥৪॥

ভব যোগেন্দ্রার্চ্চিত, ভব বিরিঞ্চিপুজিত,
ভব বিভূতিভূষিত, জয় শুভাঙ্কর ॥৩॥
ভব কপর্দ্দমণ্ডিত, ভব রণপ্রপণ্ডিত,
ভব স্থরারিখণ্ডিত, জয় দিগম্বর ॥৫॥

কৃষ্ণ-স্তোত্র।

হে মধুস্থদন, বামন, জগজনজীবন,
নিকুঞ্জ কানন-মোহন মুরারে ॥ধ্রু॥
বিপুল ভক্তবল্লভ, দৈত্যারিচয়-ছুর্ল্লভ,
মুণি কৌস্তভবল্লভ, সুশোভিত হারে ॥১॥
অচিন্তনীয় চিন্তয়, গোকুল বৈকুণ্ঠালয়,
ঘাতন আয়ানভয়, মধুকৈটভারে ॥
শান্ত শ্রীরাধিকাপ্রিয়, ধেনুপালক কালীয়,
সত্য নিত্য নীচক্রিয়, পীত পটুধারে ॥২॥
পুতনাবকনাশক, গোপালগণ বালক,
নিয়ত সুখে পালক, জগত আধারে ॥
ভুবনজনতারক, তাপপাপনিবারক,
বিপিন বেনুবাদক, পুলিন বিহারে ॥৩॥
সরসীরুহলোচন, বিশ্বতারণ কারণ,
রুচি যিনি নবঘন, দানব কংশারে ॥
দেবারিবলঘাতন, দশাননবিনাশন,
মুনিমনোবিমোহন, ধরাধরধারে ॥৪॥
মোহন নাশিকোপরি, কস্তুরি তিলকোপরি,
কিবা শোভা মরি মরি, না হেরি সংসারে ॥

ভকত বৎসল হরি, দীন হীনে কৃপা করি,
দিয়ে শ্রীচরণ তরি, রাখ ভব ধারে ॥৫॥

আড়াবাহার।

মহা মোহ মায়াবশে, মহীতে কেন মোহিতে ॥ধ্রু॥
বিহিত বিহিত জ্ঞান, বঞ্চিতে থাক বঞ্চিতে ॥
বিষম বিভব সব, উৎসবে সাধ উৎসব,
সে সব যে যাবে সব, ভাবিতে হবে ভাবিতে ॥১॥
দিব্যনেত্রে নিরঞ্জন, সদা হও নিরঞ্জন,
অঞ্জনে কর রঞ্জন বাধিতে রবে বাধিতে ॥
অন্যথা নাহি নিস্তার, বিস্তারি কি কব তার,
মোক্ষফল রস তার জানিতে হবে জানিতে ॥

রামকেলী—জলদ তেতালা।

নানারূপে মহামায়া, কত না মায়া করিলি ॥ধ্রু॥
প্রথমে মীনরূপেতে, দেবগণ উদ্ধারিলি ॥
দ্বিতীয়ে কমঠ বেশে, ধরা ধরি পৃষ্ঠদেশে,
তৃতীয়ে বরাহ রূপে, ইদং বিশ্ব প্রকাশিলি ॥১॥
চতুর্থে নৃসিংহ রূপে, হিরণ্যকশিপু ভূপে,
বিনাশি, পরম ভক্ত প্রহ্লাদেরে বাঁচাইলি ॥
পঞ্চমে ছলিতে বলি, বামন মুরতি হলি,
ষষ্ঠমে পরশুরাম রূপে ক্ষত্রি বিনাশিলি ॥২॥
সপ্তমে দয়াল রাম, নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম,
জিনিয়ে পরশুরাম, জগতে খ্যাতি রাখিলি ॥

অষ্টমে রোহিণী সুত, হয়ে হলি হলযুত,
নবমে পুরুষোত্তমে, অন্নব্রহ্ম মানাইলি ॥৩॥
দশমেতে কল্কিরূপ, বিনাশিয়ে ম্লেচ্ছভূপ,
পুনঃ সত্য স্থাপনার, সূচনা বেদে কহিলি ॥
মধ্যে মধ্যে নন্দালয়ে, পূর্ণে অবতীর্ণা হয়ে,
বাজায়ে মোহন বংশী, ব্রজবালা ভুলাইলি ॥৪॥

রামকেলী—জলদ তেতালা।

এদীন শরণাগতে, এ কেমন বিড়ম্বনা ॥ধ্রু॥
ভাবিতে দিলিনে শিবে, ভবে ভবের ভাবনা ॥
বাল্য-যুবা প্রৌঢ়কাল, দেখিতে শুনিতে কাল
গ্রাসে আসি প্রতিক্ষণে, এই তো কাল মন্ত্রণা ॥১॥
পরে বৃদ্ধকালাগতে, জপিব মা নিধিমতে,
এমন সময়ে কাল আইল দিতে যন্ত্রণা ॥
ভুলাইয়ে তব ভাবে, মহামায়া আবির্ভাবে,
লাভ মাত্র কলত্রাদি, ভাবনা অনুসূচনা ॥২॥
দিয়ে জ্ঞান মহানিধি, জপিতে করেছ বিধি,
দুর্গানাম মহামন্ত্র, সরস করি রসনা ॥
জপিবে কিরূপে তারা, অজপা হইল সারা,
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, গেল কীর্ত্তনের সম্ভাবনা ॥৩॥

সাহানা—জলদ তেতালা।

ভয়হরা ভয়ংকরা, কেরে সংহার রূপিণি ॥ধ্রু॥
দনুজ সরোজ কিবা দলিছে মত্তা নাগিনী ॥০॥

অরি-অশ্রুহ্রদ করি, বিরাজিতা দিগম্বরী,
লোহিত অম্বুধি পরি, যেন নীল কাদম্বিনী ॥১॥
চণ্ড মুণ্ড কণ্ঠমালে, অর্দ্ধচন্দ্র খণ্ডভালে,
ঘন কিঙ্কিনী নিশীলে, ঘন ঘর্ঘর ঘোষিণী ॥০॥
লোল জিহ্বা লক্ক লক্ক, ভালে বহ্নি ধক্ক ধক্ক,
নয়নাগ্নি তক্ক তক্ক, রক্তদন্তী করতালিনী ॥২॥
লট্ পট্ দীর্ঘজটা, কট্ মট্ দৃষ্টিঘটা,
কম্পিত কমঠ কটা, ঘোরনিনাদ নাদিনী ॥০॥
দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব, প্রলয় পযোধি পর্ব্ব,
অহমেতি মম ইতি, ভাষিছে হরি বাহিনী ॥৩॥

সিন্ধু ভৈরবী,—ঢিমা তেতালা।

সে দিন ত ভাবনা ॥ধ্রু॥
শ্মশানে শয়ন যবে, তবে কি হবে বল না ॥০॥
জীবন জীবনপ্রায, বিশ্ব এ প্রপঞ্চ কায়,
নিমেষে মিশায়ে যায, জেনে কি জান না ॥১॥
সতত আপন ক'য়ে, মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে,
ভ্রম চিন্তা নারী ল'যে, শেষের চিন্তা চিন্ত না ॥২॥
কস্য পিতা কস্য মাতা, কস্য সুত কস্য ভ্রাতা,
কায় প্রাণে ন'সম্বন্ধ, কা কস্য পরিবেদনা ॥৩॥

সেয়ং নদী সখি! তদেব কদম্বমূলং।
সৈষা পুরাতন তরী মিলিতা বয়ঞ্চ ॥
কিন্ত্বত্র কেলিচতুরঃ পরিহাসভাষী।
হা হা মনো দহতি নাস্তি সুকর্ণধারঃ ॥

ব্রজপুরী হেরি আঁধার—

সখি রে। ব্রজপুরী হেরি আঁধার,
সেই তো কদম্ব তরু চারু পুলিনে বিস্তার।
সেই তরী পুরাতন, সেই আমরা ব্রজবধূগণ,
সেই তো যমুনা অহহ সকল বিকল,
বিহনে মূলাধার॥

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ, কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥

পরমাত্ম-বন্দনা।

(ত্রিপদী)

নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সত্যসন্ধ সনাতন,
বিভু বিশ্বনিকেতন যিনি।
রবিচন্দ্র বায়ুগণ করে গমনাগমন,
যে দেখ কারণ তার তিনি।
আদি অন্ত নাহি তাঁর নিরাকার নিরাধার,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্।
বিশ্ব সৃষ্টিস্থিতি লয় যাঁহার আদেশে হয়,
নিত্য অস্তি তাঁহার বিধান।
যে আজ্ঞায় জলধর ব্যোম বক্ষে করি ভর,
করে বারিধারা বরিষণ।
তাঁরি ভয়ে অনুগত সুরাসুর জীব যত,
তিনি আদি অনাদি কারণ।

মহারণ্যে তরুগণ ফুলে ফলে সুশোভন,
হয় যাঁর নিয়মানুসারে,
তাঁহারি প্রভাব বলে শূন্যে কিম্বা জলে স্থলে,
সব সুখী আহার বিহারে।
আদ্য নন অন্ত নন সূক্ষ্ম কিম্বা স্থূল হন,
দুর্ঘটন করেন বিস্তার।
সর্ব্ব গতি সর্ব্বময় কিন্তু সর্ব্ব অনিশ্চয়
নাদ ব্রহ্ম প্রণব প্রকার।
অপার মহিমা তাঁর বুঝিবে কে চমৎকার,
সর্ব্বভূতে সম কৃপাবান্।
সর্ব্ব সাক্ষী অবিনাশ অন্তরাত্মা অপ্রকাশ,
কর তাঁরে তদগদে ধ্যান।

উল্লিখিত সঙ্গীত ও পরমাত্মবন্দনাটী পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার হৃদয় কাল্পনিক ধর্ম্মান্ধতা হইতে অপসারিত হইয়া ক্রমে সত্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে.আলোকময় হইয়াছিল।

মহাত্মা ব্যক্তিদিগের জীবন-চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, অধিকাংশ স্থলে মাতার সদ্গুণ পুত্রে নামিয়া তাঁহার মহত্ত্বের কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহামনা যোগেন্দ্রনাথের মাতা শ্যামাসুন্দরী বহুবিধ গুণগ্রামে ভূষিতা ছিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধি-

মতী ছিলেন, তেমনি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত ছিল। তাঁহার নিকট কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত ব্যবহার প্রশ্রয় পাইত না; স্পষ্টবাদিতা তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। এই জন্যই তিনি এক সময়ে কোন এক বিশেষ কারণে মন্ত্রদাতা গুরুকেও তিরস্কার করিতে সঙ্কুচিতা হন নাই। তিনি যেরূপ মহদ্ব্যক্তির বধূ হইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও তদুপযুক্তই হইয়াছিল। তিনি অনেক দরিদ্র সন্তানের ও ভদ্র বংশজাতা অনাথা বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। আর বাটীর সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী হইতে অতি সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকে সমান ব্যবহারে সুখী করিতেন। তাঁহার স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, পুরুষের পক্ষে পিতা মাতা যেমন প্রত্যক্ষ দেবতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা; এজন্য তাঁহার স্বামী যাহা বলিতেন, তাহা তিনি দেবাদেশের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। এক সময় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সধবা স্ত্রীলোক-

দিগের পক্ষে স্বামীপদ পূজা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, সেই অবধি তিনি প্রত্যহ পতিপদ পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। পাছে পতিপদ-পূজা কোন প্রকারে অঙ্গহীন হয়, এতৎকারণ কেহ অনুরোধ করিলেও যোষিৎ-প্রচলিত কোন ব্রতনিয়মাদি করিতেন না। কিন্তু তিনি এরূপ স্বামীভক্তিপরায়ণা হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ত্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে তিনি বিধবা হইয়া ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি অতিথি সেবা, যথানিয়মে অনাথ দরিদ্রদিগের প্রাত্যহিক ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন ও দেবসেবা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিয়া উদ্দেশে স্বামীপদ পূজা করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তীর্থ পরিভ্রমণ তাঁহার নিকটে ধর্ম্মের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। "চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং" এই বুধ-বাক্যটী যেন নিয়তই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। তাঁহার নিকটে কেহ তীর্থ ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেন,

৩

"ঘরে বসিয়া মন পবিত্র কর, তীর্থ-ভ্রমণের কার্য্য হইবে।"

তাঁহার তিন পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্র তিনটীর মধ্যে ১ম যোগেন্দ্রনাথ, ২য় নগেন্দ্রনাথ, ৩য় খগেন্দ্রনাথ, এবং কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা কৈলাসকামিনী ও দ্বিতীয়া কৃষ্ণভাবিনী। তিনি শেষ পুত্র খগেন্দ্রনাথের বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, পানদোষে খগেন্দ্রনাথ অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন। তিনি এই শেষাবস্থায় স্বামী-পুত্রশোকে জর্জ্জরীভূতা হইয়া ক্রমে সন ১২৭৮ সালে ১১ই চৈত্র সৌর চতুর্দ্দশী শনিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় সর্ব্বশোক-বিনাশক মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যোগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল—নামকরণ—তাঁহার বাল্যজীবনে ভবিষ্যৎ কালের আভাস—বাল্যলীলা—বিদ্যারম্ভ—ব্যায়ামে প্রসক্তি—বাল্যজীবনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মনোনিবেশ।

ইহা বলা বাহুল্য যে, যোগেন্দ্রনাথ পিতামহীর অত্যন্ত আদরের ধন ছিলেন। ইহাঁর পিতামহী একমাত্র পুত্রের সন্তান হওয়ায় সময়োচিত সমারোহের ত্রুটী করেন নাই। দাসদাসীদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত, অনাথ দরিদ্রদিগকে প্রচুর অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তিনি পৌত্রের মঙ্গলার্থে কল্পতরুর ন্যায় তাহাই দান করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন; ফলতঃ তাঁহার জন্মকালীন উৎসব অতি সমারোহের সহিত সমাধা হইয়াছিল। তৎকালে বাটীতে অন্য কোন শিশু সন্তান না থাকায়, তিনি হস্তস্থিত বীণার ন্যায় অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তর পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

সর্ব্বসাধারণের চিত্ত ও নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে আমাদের যোগেন্দ্রনাথ ৬ষ্ঠ মাসে পদার্পণ করিলেন। যাঁহার জন্ম কালীন উৎসবে আনন্দের ইয়ত্তা ছিল না, তাঁহার অন্ন প্রাশনের সময় যে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল, তাহা বলা পুনরুল্লেখ মাত্র।

পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্গের ত কথাই নাই, তদ্ভিন্ন অপরাপর দর্শকবৃন্দ প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলিতেন যে, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অতি সুন্দর। এজন্য পুরমহিলারা প্রায়ই তদ্ব্যঞ্জক নূতন নূতন নামে তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন ও সকলেরই ইচ্ছা ছিল, তাঁহার এরূপ একটী নাম হয়। তাঁহাদের বাসনা বাস্তবিকই কার্য্যে পরিণত হইল। "প" অক্ষর রাশিক নামের আদ্যক্ষর হওয়ায়, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী পুরমহিলাগণের সহিত একমত হইয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার "পদ্মপলাশলোচন" নাম রাখিলেন। ইহাতে পুরস্ত্রীবর্গের আনন্দের অবধি রহিল না।

এইরূপে বহুযত্নে লালিত পালিত হইয়া

যোগেন্দ্রনাথ ৩।৪ বৎসরে উন্নমিত হইলেন। এই সময় তাঁহার বাল্য-জীবনে ভবিষ্যতের উন্নতিবীজ দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের যোগেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে কিরূপ শান্তিপ্রদ শীতল ছায়া প্রদান করিয়া দেশ-বাসীগণকে সুখী করিবেন,তাহার অনেকটা আভাস তাঁহার বাল্যলীলায় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সে নিজেই ছিন্ন পত্রাদি সংগ্রহ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ন্যায় কত আগ্রহের সহিত নিকটস্থ ব্যক্তিকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি সে সময়ে কেহ উহাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কোলে লইয়া আদর করিত, তাহা হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর লাভ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না।

এই সময় এই ক্ষুদ্র সুকোমল হৃদয়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের একটী সুমহান্ কার্য্যের সূচনা লক্ষিত হইয়াছিল। কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষগণের বাল্য-ক্রীড়াই বল, হাস্য পরিহাস বা আমোদ উৎসবই বল, তাঁহাদের যে কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের হৃদয় কোন

এক গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত থাকে। তাঁহাদের হৃদয় শয়নে বা জাগরণে, নির্জ্জনে বা লোকারণ্যে, বাল্যে বা যৌবনে, সকল সময়েই যেন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাকে। এমন কি, তাঁহাদিগের প্রতি পদক্ষেপ যেন এক একটী সুমহান্ কার্য্যের পূর্ব্বসূচনা। কে জানিত যে, ইটালীর ক্ষণজন্মা "রায়েনজী" রোমীয় সম্ভ্রান্তদিগের কেলিনিকেতন হইতে ট্রিবিউন অর্থাৎ শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইবেন? কে জানিত যে, স্কট্লণ্ডবাসী মন্ত্রিবর "কলবর্ট" চতুর্দ্দশ লুইর সামান্য আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইতে অবশেষে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদে অধিরোহণ করিবেন এবং কেই বা জানিত যে, বীরশ্রেষ্ঠ "নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি" বিদ্যালয়ের সহপাঠীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তুষার কর্কর বিমিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলা প্রস্তুত করিয়া নর্ম্ম যুদ্ধে একাকী এক শত বালককে পরাস্ত করিয়া কালে সমস্ত ইউরোপকে কাঁপাইয়া দিবেন? মহাপুরুষদিগের বাল্যের ক্রীড়া-কন্দুকও কালে মহাগিরি হিমালয়কে চূর্ণ করিতে পারে।

আমাদের যোগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে তাঁহার ভবিষ্যৎ চিত্র দেখা গিয়াছিল। তিনি কতকগুলি ছোট ছোট পুতুল ক্রয় করিয়া ৮।১০টীকে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া বসাইতেন ও স্বয়ং একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরি একটী বড় পুতুলকে বসাইতেন। এইরূপে তিনি একটী ক্রীড়া-বিদ্যালয় করিতেন। সকলেই এই ক্রীড়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া মুখচুম্বন করিতেন। কোন নিকৃষ্ট খেলার প্রতি তিনি লক্ষ্য করিতেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাঁহার খেলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন এবং বলিতেন, কালে ইনি একজন মহাপুরুষ হইবেন।

তিনি অন্য অন্য ছেলেদের ন্যায় নিরন্তর "বাহ্না" করিয়া পিতা মাতা ও অপর সাধারণকে বৃথা বিরক্ত করিতেন না। বাল্যকালে তাঁহার একটী প্রধান বাহ্না এই ছিল যে, যাহাকে সম্মুখে লিখিতে দেখিতেন, তাহাকেই বলিতেন, "আমি লিখ্‌বো—আমি লিখ্‌বো।" তিনি যতক্ষণ না কাগজ কলম পাইতেন, ততক্ষণ তাহাকে ব্যস্ত করিতে নিরস্ত হইতেন না। শৈশবকালেও যাঁহার বিদ্যা

শিক্ষার জন্য এরূপ অসাধারণ একাগ্রতা ছিল, কালে যে তিনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? উপযুক্ত পিতা কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে ৫ম বর্ষে পড়িলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের প্রায় তাবৎ কার্য্যই ধর্ম্মসম্পৃক্ত। এই জন্যই হিন্দুরা সকল কার্য্যের পূর্ব্বে ইষ্ট-দেবতার প্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আরব্ধ কার্য্যের সূচনা করিয়া থাকেন। শিশুদিগের বিদ্যারম্ভ কার্য্যেরও পূর্ব্বে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যে বিদ্যা প্রভাবে বল-বীর্য্যবিহীন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিশু বলবীর্য্যবিশিষ্ট, জ্ঞানালোকে বিভূষিত ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া মনুষ্যলোকে বিচরণ করিবে, সেই বিদ্যাশিক্ষারূপ হিতকর কার্য্যের আরম্ভ কালে যে কোন মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে না, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে সম্ভবে না। আমাদের দেশে পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্তানের "হাতে খড়ি" দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চম বৎসর বয়সে অর্থাৎ সন্ ১২৪৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের

পূর্ণিমা তিথিতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যোগেন্দ্র নাথের "হাতে খড়ি" হয়।

এই সময় ইহাঁকে পাঠশালায় পাঠাইবার আবশ্যক হইল; কিন্তু ইহাঁর পিতা অতি বিচক্ষণ বহুজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষতঃ শিক্ষা-নীতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, অধিক বয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা দেওয়া কঠিনতর কার্য্য। ছাত্রদিগের বয়সের অল্পতানুসারে শিক্ষকতা কার্য্যের দায়িত্ব বৃদ্ধি হয়, অনেকে ইহা বিশিষ্টরূপে অনুধাবন না করিয়া একজন অতি অপকৃষ্ট ব্যক্তির উপর সন্তানদিগের শিক্ষাভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন; কিন্তু তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে, ভিত্তিতে দোষ জন্মাইলে, সে দোষ সংশোধন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। যে শিক্ষায় কুসংস্কার বর্দ্ধিত হয়, যে সংসর্গে চরিত্রের অপকর্ষ সম্পাদিত হয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয় এবং সে সংসর্গ অগৌণে পরিত্যজ্য। অনেকে স্বীয় সন্তানদিগকে অবিবেচনার সহিত কুসংস্কার ও কুসংসর্গের প্রধান লীলা-

ক্ষেত্রে গুরু মহাশয়ের বিরাম মন্দিরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।*

যে সময় হইতে সন্তানদিগের দর্শন ও শ্রবণ শক্তি প্রস্ফুটিত হয়, সেই সময় হইতেই তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সুতরাং প্রথম শিক্ষার সময় তাহারা দেখিয়া শুনিয়াই হউক, অথবা গুরুজন বা অপর সাধারণের নিকট হইতেই হউক, সম্মুখে যাহা নূতন পাইবে, তাহাই শিক্ষা করিবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। আর এই সময়ে সাংসারিক কুটিলতা-বর্জ্জিত সরল হৃদয়ে একবার যাহা প্রতিফলিত হইবে,তাহা প্রস্তরাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় চিরজীবনের নিমিত্ত খোদিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহুবিধ চিন্তার পর জগন্নাথ বাবু পুত্রকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় না পাঠাইয়া বাড়ীতে একজন উপযুক্ত শিক্ষক রাখিলেন এবং যাহাতে শিক্ষাকার্য্যের ঔৎকর্ষ্য সম্পাদিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

---

* পূর্ব্বে পাঠশালার অবস্থা অতি জঘন্য ও ঘৃণিত ছিল। এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সম্পাদিত হইতেছে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি।

এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সন্তান উৎপাদন করিয়া তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রভূত ধন সঞ্চয় এবং তাহাদের শরীর রক্ষা ও তৎপুষ্টির নিমিত্ত আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হইল বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহা অন্ততঃ একবারও মনে ভাবেন যে, যাহার প্রভাবে মানব মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, এমন কি, যাহা মনুষ্যের জীবন স্বরূপ, সেই অপৌরুষেয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম-ভূষণে সন্তানদিগকে ভূষিত করাও পিতামাতার এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাঁহারা বলেন যে, অবস্থার দীনতাবশতঃ অথবা বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা স্বয়ং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার অবসর পান না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, একটী কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করিতে যাইয়া অপর একটীকে অবহেলা করা কি যুক্তিযুক্ত কার্য্য? আর নিয়ত বিষয়কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া সন্তান-দিগের নিমিত্ত রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করাও কি যুক্তিসিদ্ধ? ইহাতে কি প্রকারান্তরে তাহাদিগকে

পরিশ্রম করিতে নিষেধ করা হয় না? এই জগতী-তলে ধনসম্পত্তি ভিন্ন কি এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার অধিকারী হইলে আজন্মকাল সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত হইতে পারে? যে সকল সদ্‌-গুণ থাকিলে মনুষ্যেরা সহজেই ধনসম্পত্তি অপেক্ষা অধিক সুখে সুখী হয়, সকল ধনের অভাব দূর করিয়া অনন্ত সুখের আকর হয়, এরূপ সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে সামান্য ধনের অধিকারী করা কি বিড়ম্বনা নয়? যাহাতে সন্তানদিগের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, জ্ঞান কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করে, হৃদয়ে অতৃপ্ত বিদ্যানুরাগ ও সার্ব্বভৌমিক উদারতা স্থান প্রাপ্ত হয়, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি সপ্রণয় ব্যব-হার, নিঃস্বার্থ-পরহিতৈষিতা, জ্বলন্ত দেশভক্তি, ঈশ্বরে প্রীতি, ধর্ম্মে রতি ও পাপে বিরতি জন্মে, এবম্ভূত স্পৃহণীয় সদ্‌গুণ-ধনে সন্তানদিগকে ধনী করা কি শুভকর নহে? অনেকানেক মহাত্মা বলেন যে, স্বজাতির গৌরব, সমাজের কল্যাণ ও রাজ্যের কুশল প্রার্থনা করিলে সর্ব্বাগ্রে স্ব স্ব সন্তানগণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। যাঁহাদের

অধিকার থাকিলেও তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া উক্ত ত্রিবিধ কল্যাণের অপনয়ন করেন, তাঁহারা বাস্তবিক প্রত্যবায়ভাগী হন। এইজন্যই যোগেন্দ্র-নাথের পিতা কেবলমাত্র শিক্ষকের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং অবসরগত পুত্রকে নানা নীতি বিষয়ক উপদেশ দিতেন। পাঠ্যবিষয় লইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন। বাল্য-কাল হইতেই তাঁহাকে নম্র ও ধর্ম্মপ্রবণ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নীতিপূর্ণ শ্লোক সকল মুখে মুখে শিখাইতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পদ্যে অনুবাদ করিয়া সমূল তাঁহাকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন—

মাতাসুরেশী চ পিতা মহেশঃ,
অহং গণেশঃ কিলবিঘ্ননাশনঃ।
তথাপি চাহং করিমুণ্ডধারী,
কপালং কপালং কপালং হি মূলং॥

মাতা যার সুরেশ্বরী জনক শঙ্কর।
মম নাম গণপতি হই বিঘ্নহর॥
তথাপি আমার স্কন্ধে শোভে করি শির।
কপাল কপাল সার! কহিলাম স্থির॥

এইরূপে যোগেন্দ্রনাথের পিতা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত পিতা কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়া শৈশবকাল হইতেই হৃদয়ের ধর্ম্মপ্রবণতা, বিদ্যাভ্যাসে অপরিমিত পরিশ্রমশীলতা ও সর্ব্ববিষয়ে সহিষ্ণুতা দর্শাইতে লাগিলেন। এইরূপে আন্দুলের বাটীতে থাকিয়া ন্যূনাধিক দুই বৎসরকাল বাটীর শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পাঠশালায় শিক্ষিতব্য বিষয় সকলের অধিকাংশ আয়ত্ত করেন।

এই সময় হইতেই বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত কিছু কিছু ব্যায়াম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এবিষয় তাঁহাকে কেহ শিক্ষা দেন নাই। বাটীতে দ্বারবানগণের প্রাতঃকালীন শরীরসঞ্চালন দেখিয়া তাঁহারও ঐরূপ করিতে ইচ্ছা হইল। বিশেষতঃ এই সময়ে তাঁহার পিতার নিকট হইতে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" অর্থাৎ শরীরই প্রধান ধর্ম্মসাধন, এই বিষয়ে অনেক উপদেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ইহার যথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু ব্যায়াম আরম্ভ

করিলেন। এক্ষণে আমাদের দেশের অভিভাবকেরা বালকদিগকে সর্ব্বদাই লেখাপড়া শিক্ষার জন্য মানসিক পরিশ্রম করিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হন; কিন্তু শারীরিক উন্নতির নিমিত্ত তাহাদিগকে কোন প্রকার ব্যায়াম করিতে দেখিলে সন্তোষের পরিবর্ত্তে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করেন। সন্তানেরাও অল্পবয়সেই রুগ্ন ও শারীরিক বলবীর্য্যবিহীন হইয়া অবশেষে এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়াও যে অভিভাবকেরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া তাহাদের শরীরকে সবল ও সুস্থ রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। এরূপ না হইলেই বা আজ হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের এরূপ দুরবস্থা হইবে কেন?

যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি বাল্যকাল হইতেই তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের যোগেন্দ্রনাথ অতি শৈশবকাল হইতেই প্রকৃত্যনুযায়ী কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি কোন বিশেষ ঘটনা দেখিলে অথবা কাহারও মুখ হইতে শুনিলে তাহার ফলাফল

ও তৎসংক্রান্ত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব মনে মনে বিচার করিতেন। ইহাঁর বয়স যখন ন্যূনাধিক সাত বৎসর, সেই সময়ে ইহাঁর হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম ব্যায়াম করিবার ইচ্ছা উদ্রিক্ত হয়। ব্যায়ামের কথা মনে উদয় হইবামাত্রই ইহার উপকারিতা কি, লোকে কেনইবা ব্যায়াম করে, না করিলেই বা কি হয়, এই সকল প্রশ্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদা আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ন্যায় ঐ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও আগ্রহের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

"ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং,
স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং চর্য্যাতমঃ স্মৃতঃ।
লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা,
দোষক্ষয়োঽগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে।
ব্যায়ামং কুর্ব্বতোনিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং,
বিদগ্ধমবিদগ্ধং বা নির্দ্দোষং পরিপচ্যতে।
ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যং মর্দ্দয়ন্তি বয়োবলাৎ,
ন চৈনং সহসাক্রম্য জরা সমধিগচ্ছতি।"

তদবধি তিনি ব্যায়ামের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং পরিণত বয়সে অপরকেও মানসিক উন্নতির সহিত শারীরিক উন্নতির নিমিত্ত উপদেশ দিতেন।

এই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে আর একটী সর্ব্বলোক-প্রীতিকর সুন্দর ভাবের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে শিক্ষক ও পিতার নিকট প্রায়ই চাণক্যের নীতিপূর্ণ শ্লোকগুলি আগ্রহপূর্ব্বক শুনিতেন। একদিন তাঁহার শিক্ষকের নিকট চাণক্য পণ্ডিতের "বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" এই শ্লোকটীর অর্থ শুনিলেন এবং শুনিবামাত্র যেন তাঁহার মনোমধ্যে একটী অতি দিব্য স্বর্গীয়ভাবের উদয় হইল। সেই ভাবাবেশ তাঁহার হৃদয়ে এত সংলগ্ন হইয়াছিল যে, শিক্ষক মহাশয় চলিয়া গেলে বাটীমধ্যে শুইবার সময়ও তাঁহাকে মন্ত্রগ্রাহী ভাবুকের ন্যায় চিন্তামগ্ন দেখা গেল। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ঈদৃশ ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা ভাবটী আদ্যোপান্ত বলিলেন।

তাঁহার মাতা এত অল্প বয়সে পুত্রের এ প্রকার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া আনন্দে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন এবং বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি আরও নানা প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার সেই জ্বলনশীল অগ্নিকে আরও সন্ধুক্ষিত করিয়া দিলেন। এই সময় হইতেই তিনি মনে মনে ধনাভিমান ও পদাভিমান উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত বিদ্যালাভ করাই তাঁহার জীবনের সার কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন। উত্তর কালে এই শ্লোকটীই তাঁহার জীবনের পথপ্রদর্শক হয়। বাস্তবিক, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবন কি সুন্দর ভাবে গঠিত হইয়াছিল। আন্দুল ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দ, এমন কি বাটীর দাস দাসীগণও কখন তাঁহার অমূল্য জীবন মধ্যে কিছু মাত্র ধনাভিমান ও পদাভিমান লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

অনেকানেক ধর্ম্মপ্রাণ সাধু মহাত্মারা বলেন যে, চরিত্র গঠন করিতে হইলে মনুষ্যলিখিত গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক নাই। পরমগুরু পরমেশ্বর লোক

শিক্ষার নিমিত্ত বিশাল প্রকৃতি-গ্রন্থ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার এক একটী পত্র উদঘাটন কর, দেখিতে পাইবে যে, কত মহান্ উপদেশ সকল তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথের জীবনে এই কথার স্ফলতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সেই প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রকৃতিরাজ্যে যখন যেটী দেখিতেন, তৎক্ষণাৎ সেইটীর তথ্য জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেন। সূর্য্য কিরূপে উদয় হয়, কি প্রকারেই বা অস্ত যায়, আকাশ হইতে কিরূপে জল পড়ে, কিরূপে রাত্রি হয়, রাত্রি কোথা হতে আসে, সে কোথাই বা যায়, এই সকল গুরুতর বিষয় তাহার মত ক্ষুদ্র জীবনে বিকাশ পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ জটিল প্রশ্নও তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার শিক্ষক উক্ত প্রশ্নের উত্তরে পুরাণ-প্রতিপাদ্য কতকগুলি প্রচলিত গল্প বলিতেন; কিন্তু যাঁহার ঈদৃশ ক্ষুদ্র জীবনে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির ন্যায় বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন উত্থিত হইত, সে

হৃদয় কি অযৌক্তিক গল্পনিবদ্ধ উত্তরে সুখী হইতে পারে? সুতরাং তিনি তৃপ্তিলাভ না করিয়া পূজ্যপাদ পিতার নিকট ঐ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি দর্শন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কতকটা বুঝাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, "বাপু, এ সকল অতি গুরুতর বিষয়; পড়, তবে জানিতে পারিবে।" সার উইলিয়ম জোন্স যেমন বাল্য-কালে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মাতা বলিতেন, "পড়, জানিতে পারিবে" ইহাঁর ভাগ্যেও কতকটা তাহাই ঘটিয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ইংরাজি শিক্ষা—বিদ্যালয়ে প্রবেশ—বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন—সহপাঠী বালক-
দিগের সহিত ব্যবহার—সংস্কৃতশিক্ষায় আগ্রহ—তাঁহার
চরিত্র—দয়া ও সত্যবাদিতা।

এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথের ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন হইল। এখন যেমন চতুর্দ্দিকে ইংরাজি শিক্ষার উপযোগী রাশি রাশি উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, স্থানে স্থানে বহুল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উক্ত ভাষা শিক্ষা সুগম হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন কলিকাতা শ্রীরাম-পুর প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্ট অথবা মিসনরি সাহেবগণ কর্ত্তৃক দুই একটী স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাঁহাদের ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যক হইত, তাঁহাদিগকে উক্ত স্থলে যাইয়া শিক্ষা করিতে হইত; সুতরাং অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও নানাবিধ অসুবিধা পরম্পরায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। যোগেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত

জমিদার-কুলসম্ভূত, বিশেষতঃ উপযুক্ত শিক্ষিত পিতার আদরের পুত্র। মণিমুক্তা-সম্মিলনে স্বর্ণালঙ্কার যেমন সুন্দর দেখায়, সেইরূপ যোগেন্দ্রনাথের কোমল হৃদয়ে বিদ্যার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হওয়ায়, তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণনিচয় যেন আরো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিতার পার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু রাজভাষা ইংরাজি না জানিলে জমিদারী সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সমূহ অজ্ঞাত থাকিয়া জমিদারী রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে; এজন্য বাটীর সকলেরই ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষার্থে কলিকাতা প্রেরণ করেন। কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে মল্লিক বাবুদের একটী বাটী ছিল। প্রথমে সেইখানে রাখিয়া পড়াইবার বন্দোবস্ত হয়। পরে বহুবাজারস্থ সুবিখ্যাত দত্ত বংশোদ্ভব মহাত্মা অক্রূরচন্দ্র দত্তের পুত্র দুর্গাচরণ দত্তের বাটীতে রাখিলেন। উক্ত দত্তজা মহাশয় ইহাঁর নিকটাত্মীয়। দুর্গাচরণ বাবু ইহাঁর পিতৃস্বস্থ ঠাকুরাণী শ্রীমতী বিমলা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। প্রিয়দর্শন যোগেন্দ্রনাথ পিশীমাতা ঠাকুরাণীর অতি

প্রিয়পাত্র ছিলেন। তথায় সেই একমাত্র আত্মীয় পিশীমাতার নিকট থাকিয়া অধিকতর যত্নের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। আত্মীয়েরা এখান হইতে প্রায়ই তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। তিনি তথায় কোন্ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া প্রথম ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন,তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে যদিও দু একটী রত্নের আবির্ভাব দেখা যায়; কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশাবলীর অবগতির নিমিত্ত তাঁহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আলেখ্য অঙ্কনে সমর্থ হওয়া যায় না। ইতিহাস না থাকাতে বিদ্যার আদর্শ স্থল,সভ্যতার আদর্শভূমি ভারতমাতা অতি প্রাচীনকাল অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে কত শত অতিমানুষের জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মশীল মহাপুরুষগণকে প্রসব করিয়াছেন,এখন আর তাহা কে নির্ণয় করিবে? যদি এই দগ্ধ ভারতে একটী মাত্র "হেরডটস্" জন্মাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম যে, কত মহাপুরুষ আমাদের সহোদর ছিলেন। কিন্তু হায়! সে আশা আমাদের দুরাশা মাত্র; তাই আজ আন্দুল ও তাহার প্রান্ত-

বর্ত্তী গ্রাম সমূহের বর্ত্তমান সুখ সৌভাগ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনী এত অজ্ঞাত। যাই হউক, তিনি যে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশাবধি এত আন্তরিক যত্নসহকারে অধ্যয়ন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন যে, বাটীতে আসিবার নিমিত্ত অনুনয় করিলেও সহজে আসিতেন না। তিনি বৎসরে দুই বার করিয়া বাটী আসিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। একবার আশ্বিন মাসের শারদীয়া মহাপূজোপলক্ষে আর একবার গ্রীষ্ম কালে। এই দুই সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিত, সুতরাং যাতায়াত জনিত অধ্যয়নে কোন প্রকার ক্ষতি হইবেক না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমাগত ৫ বৎসর কাল সমধিক পরিশ্রমসহকারে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ইহাদের একটী পৈতৃক বাটী ছিল। কিছুদিন পরে কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহারি মাতা পিতা উভয়কেই উক্ত

বাটীতে বাস করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আর তাঁহাকে দত্ত মহাশয়ের বাটীতে থাকিতে হইল না; পিতা মাতার নিকট মেছুয়াবাজারের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি এত লোকপ্রিয় ও সহিষ্ণু ছিলেন যে, পাঁচ বৎসরকাল এক স্থানে বাস করিয়াও একদিনের জন্য কাহারও নিকট বিরাগভাজন হন নাই। বাল্যচপলতাবশতঃ কোন বালকের সহিত কখন বচসাও করেন নাই; সকলকেই আন্তরিক স্নেহ সহকারে আপন সহোদরের ন্যায় যত্ন করিতেন। শুনা যায় যখন তিনি মেছুয়াবাজারের বাটীতে আসিয়া বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক "ট্রেনিং" স্কুলে নূতন প্রবেশ করেন, তখন পূর্ব্ব বিদ্যালয়ের সহপাঠী বালকগণ ও শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাকে রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন করা তাঁহারও ইচ্ছা না, কিন্তু তাঁহার পিতা দূরতা পরিহারার্থে উক্ত ব্যবস্থা করেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষা যেরূপ সুপ্রণালী-বদ্ধ ও শনৈঃ শনৈঃ বিস্তীর্ণ হইয়া অল্প সময় মধ্যে

অধিক শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে,তৎকালে সেরূপ ছিল না। সুতরাং আশানুরূপ ফললাভে অধিক সময় অতিবাহিত হইত। যোগেন্দ্রনাথ অল্পকালের মধ্যে ইংরাজি ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পাঠে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা তাঁহার একটী প্রধান গুণ ছিল। প্রত্যহ বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাধা করিয়া কোন না কোন নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে মনঃসংযোগ করিতেন। যে সকল বালক স্বভাবতঃ সচ্চরিত্র ও অধ্যয়নশীল তাহারা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইত। আর যাহারা তাঁহাকে ধনীর সন্তান দেখিয়া প্রিয়পাত্র হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অপরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইত, স্পষ্টবক্তা যোগেন্দ্রনাথ তাহাদিগের দোষ দেখাইয়া নিরস্ত করিতেন। এইরূপে তিনি দিন দিন চরিত্রে ও বিদ্যায় উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি অপেক্ষা সংস্কৃতের প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও বিশেষ আগ্রহ জন্মাইল। তিনি ক্রমে ক্রমে সহজ সহজ সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার পিতার

যে সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত ছিল, তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যোগেন্দ্রনাথ কখনও গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করেন নাই। বাল্যকাল হইতে তিনি বাটীতে বসিয়া বাল্যশিক্ষকের ও পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট হইতে সংস্কৃত ভাষার আস্বাদ পান। দেবভাষা সংস্কৃতের সুমধুর বচনমাধুরী ও অনুপমেয় রচনা-পারিপাট্য বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিল। প্রথম হইতেই তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ হয়। কিন্তু শৈশবের প্রারম্ভে তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তির পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল অবধি তিনিও বিশেষ আগ্রহের সহিত রাজভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু একক্ষণের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা অপগত হয় নাই। ক্রমে তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালেই নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন।

এই সকল গ্রন্থপাঠে তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশেষরূপ পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাঁহার হৃদয় কুসংস্কারমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্যোতির আধার হইয়া উঠিল। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অধিকাংশ সময় ধর্ম্ম চিন্তায় কালক্ষেপণ করিতেন।

যে সময় দেশমধ্যে অজ্ঞানান্ধকারের নিবিড়-তায় জ্ঞানের বিন্দুমাত্র জ্যোতি স্ফুরিত হইত না, যে সময়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার বিন্দুমাত্র রশ্মি আন্দুল ভূমিতে নিপতিত হয় নাই, যে সময়ে এখানে একটীও ইংরাজি বিদ্যালয় বা একটী প্রকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন একজন বালকের পক্ষে ইংরাজি ও সংস্কৃত শিখিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বের পরিচিন্তনে অগ্রসর হওয়া সামান্য প্রতিভার কার্য্য নহে। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসও দিন দিন উন্নত ও বদ্ধমূল হইতে লাগিল। যাহার জ্ঞান যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসও সেই পরিমাণে সংস্কৃত ও উন্নত হইয়া থাকে। যে সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞান সম্যক্ প্রকারে

বিস্তীর্ণ হয় নাই, সে সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় বিশ্বাসপ্রভাবে দৃঢ় হইতে পারে; প্রেম, ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি মনকে অতি উচ্চে লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তাহার সেই অবিচলিত বিশ্বাস অনেক সময়ে ভ্রম পথের পরিচালক হয়। লোকদুর্লভ প্রেম, ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা অপাত্রে অর্পিত হইয়া অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞানই ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ ও সহায়। আবার মনুষ্যজীবনের ইহ পরলোকের সার্ব্বভৌমিক উন্নতি ধর্ম্মসাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ সর্ব্বমঙ্গলাকর জ্ঞানের উন্নতি না হইলে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ ও সর্ব্বজনস্পৃহণীয় ধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া থাকে। আমাদের মাতৃভূমি জ্ঞানপথের পথিক ছিল বলিয়াই, অতি প্রাচীন কাল হইতে সত্য ধর্ম্মের লীলানিকেতন হইয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে কুসংস্কার সকল দূরীভূত হইয়া অপৌরুষেয় বেদপ্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ উদ্ভূত হইয়া ভারতকে জগৎপূজ্য

করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হায়! কালের কি অনন্তলীলা! দেখিতে দেখিতে সেই জগতের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানধর্ম্মের আকরভূমি ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অবনতির সোপানে নামিতে লাগিল। দুই একটী ধর্ম্মপ্রাণ, বিবেকপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়গুহা ব্যতীত প্রায় তাবৎস্থান হইতে সত্যধর্ম্ম লুপ্ত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শূন্যস্থান পরিপূরণের নিমিত্ত পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রনিচয় প্রকাশিত হইয়া সমাজের তৎকালীন দুরবস্থার পরিচয় প্রদান করিল। ভারতবর্ষ কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই দেখা যায় যে, জ্ঞানের উন্নতি ও অবনতির উপর ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে এবং ধর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষের উপর মনুষ্যজীবনের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। যোগেন্দ্রনাথের অধ্যয়নে যেমন সম্যক্ যত্ন ও অত্যধিক আসক্তি ছিল, সেইরূপ তিনি যে বিষয়টী পাঠ করিতেন, তাহার সম্যক্‌রূপে অর্থপরিগ্রহ করিতেন। এই কারণে সে সময়ে তিনি ধর্ম্ম শিক্ষার আকর সদৃশ উপনিষদ প্রভৃতি অশেষ

জ্ঞানপ্রদ পুস্তক সমূহ অধ্যয়ন না করিলেও কেবল মাত্র কতকগুলি সহজবোধ্য জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় পুস্তক পাঠ করিয়াই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

অনেকানেক মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে, "প্রত্যেক মানবের আত্মাই এক একটী অমূল্য রত্নস্বরূপ।" এই বুধবাক্যটীর অভ্যন্তরে যে কত শত গূঢ় অর্থ লুক্কায়িত আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষ যতদিন না তাহা সম্যক্‌-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ততদিন সে আত্মমর্য্যাদা এবং আত্মোন্নতির জন্য যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যে আমি নরকের কীট হইয়া ক্ষণভঙ্গুর সংসারের আপাত-মধুর পরিণামবিরস সুখে মুগ্ধ রহিয়াছি, ছার স্বার্থের মায়ায় ক্রীতদাসের ন্যায় পশুবৎ ব্যবহারে অমূল্য জীবনকে ব্যয় করিতেছি, সেই আমি ইচ্ছা করিলে পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া সাধুতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে পারি, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যতদিন না মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তত

দিন মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারে না। মানুষ নিয়তই আশার কুহকে মুগ্ধ। আমার যদি মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, আমি শতচেষ্টা করিলেও কোন কার্য্যে সফলকাম হইতে পারিব না, বহু অধ্যবসায়েও পাপের ভীষণ হ্রদ হইতে মুক্ত হইতে পারিব না, তাহা হইলে আমার পক্ষে ভাল হওয়া আকাশকুসুমপ্রায় সুদূরপরাহত। কিন্তু আমার যদি উল্লিখিত রূপ আশা ও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমি যত কেন নীচ ও অত্যাচারী হই না, নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কৃপায় শীঘ্রই সাধুজন-সম্মত ধর্ম্মপথের পথিক হইব, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিব ও হৃদয় হইতে চিরজীবনের ন্যায় স্বভাবের দূষণীয় ভাবগুলি পরি-হার করিব। ইহা নিশ্চয় যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর মনুষ্যহৃদয়ে এমন একটী অভাবনীয় স্বর্গীয় শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন যদ্দ্বারা মনুষ্য ইচ্ছা করিলে নিমেষ মাত্র সময়ে সর্ব্ব-নাশকর পাপের সুদৃঢ় শৃঙ্খলকেও সহজে ছিন্ন করিতে পারে; নিতান্ত ঘৃণিত পতিত আত্মাও দেখিতে দেখিতে পবিত্র সাধু হইতে পারে

এবং যে ব্যক্তি একবারে সংসারের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া স্বার্থের দাস হইয়াছে, সেও নির্ব্বেদ-যোগে সাধু মহাত্মা হইয়া ঈশ্বরের সহবাসলাভ করিতে পারে।

মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীর অজস্র করুণায় প্রতিপালিত হইয়া প্রভুত্বের উচ্চতম শিখরে নিয়ত পরিভ্রমণ করিলেও ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে যথেচ্ছাচারী হইতে দেখা যায় নাই। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখে যেরূপ চরিত্রোৎকর্ষের অন্তরায় সমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বেচ্ছা-চারিতার একশেষ দেখাইয়া মনুষ্যজীবনের স্পৃহণীয় চরিত্রকে অবনতির শেষ সোপানে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার শৈশবের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও সৎশিক্ষা অন্তরায় সমূহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ব্বলিখিত স্বর্গীয় ভাবটী নিয়তই ধ্রুবতারার ন্যায় প্রকাশিত থাকায়, সামান্যপদস্থ নীচ সম্প্রদায় লোকের প্রতিও কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নাই।

তিনি ক্রমে ক্রমে যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব

এই তিনটীরই অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু একটীও তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আপনার অধিকারভুক্ত করিতে পারে নাই। তিনিই উহাদিগকে যথা বিধানে পরিচালন করিতেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, যৌবনের সহিত মনের একপ্রকার তমঃ উপস্থিত হইয়া অতিবিশুদ্ধচিত্ত উদারস্বভাব ব্যক্তিকেও গর্ব্ব ও অহঙ্কারের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলে; দুরন্ত বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়দিগকে এরূপ অধিকার করিয়া ফেলে যে, ন্যায়বিগর্হিত অতি অসৎকর্ম্ম সম্পাদনেও বিন্দুমাত্র লজ্জা হয় না। আবার সেই অহঙ্কার ধনেরও একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। অহঙ্কৃত পুরুষেরা আপনাপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকেও মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে না; আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ও গুণবান্ জ্ঞান করিতে আদৌ সঙ্কুচিত হয় না। সাধারণতঃ এইরূপ আচরণে তাহাদের অন্তঃকরণ এতাদৃশ বিকৃত হইয়া পড়ে যে, যদি কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি যথার্থ কথা বলেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি খড়গহস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু মহান্ হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন

না। যদিও তাঁহার অনর্থ-পরম্পরার বহুল হেতু বিদ্যমান ছিল, তথাপি ইহাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সারগ্রাহিতা ও দূরদর্শিতা থাকায়,সর্ব্ববিধ অন্তরায় অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম সাদরে রক্ষিত হইয়াছিলেন।

এতাবৎ কালাবধি দয়াপর যোগেন্দ্রনাথের দয়ার বিন্দুমাত্র পরিচয় প্রদান করি নাই। তাঁহার স্বাভাবিক সৌম্যভাব যেমন লোকসাধারণের নেত্র-তৃপ্তিকর ছিল, বাল্যকাল হইতে তাঁহার অলোক সাধারণ দয়াও তেমনিই সাধারণের চিত্ত রঞ্জন করিত। প্রথমে এই দয়া বাল্যক্রীড়ায় প্রকাশ পাইয়া বয়সের পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া জনসাধারণের উপকারার্থে অযা-চিতভাবে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার কোমল হৃদয় পরদুঃখ দেখিলেই কাঁদিয়া উঠিত। অপরা-পর ব্যক্তির ন্যায় তিনি দুঃখ চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। যে কোন প্রকারে হউক, বিপন্ন ব্যক্তির অন্ততঃ আংশিক উপকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। তিনি বাল্যকালে অর্থাৎ যখন কলিকাতায় ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত অবস্থান করেন, তখন পিতার নিকট হইতে ব্যয়ের জন্য

প্রতি মাসে যাহা প্রাপ্ত হইতেন, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব দূরীকরণ ব্যতীত প্রায় তাবতই দারিদ্র্যদুঃখ-প্রপীড়িত সহপাঠী বালকদিগের জন্য ব্যয় করিতেন। কোন বালকের হয়ত পুস্তকাভাবে পাঠের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সে অভাব দূর করিতেন। কেহ বা কাগজের অভাবে লিখিতে পায় না, দয়ালহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ অবগত হইয়া তাহা নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সকল কার্য্য যেন তাঁহার বাল্যকালের একপ্রকার ক্রীড়া হইয়াছিল। আজ কাল যেমন অধিকাংশ লোকে দান করিয়া ধন্যবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত গৃহীতার মুখের প্রতি অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া থাকেন অথবা দানের পরিমাণ বৃদ্ধি-হইলে সংবাদ পত্রের স্তম্ভমধ্যে স্বীয় নাম দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহার সেরূপ ছিল না। বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি খৃষ্টের মুখবিবর হইতে নিঃসৃত অমৃতনিস্যন্দিনী উপদেশাবলীর মধ্যে যেমন দান সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"যখন তোমার দক্ষিণ হস্ত দান করিবে তোমার বামহস্ত যেন তাহা জানিতে না পাবে,"

আমাদের যোগেন্দ্রনাথও সেইরূপ নিঃশব্দে নিস্বার্থ ভাবে দান করিতেন ; পাছে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য তিনি অতি গোপনভাবে বিরলে লইয়া লোকের অভাব পূরণ করিতেন। এই জন্য আমরা বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার দুএকটী দান ব্যতীত আর কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর উদাহরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল।

একদা কোন দরিদ্র বালক কলিকাতায় আসিয়া বিষম বিপদে পতিত হয়। সে প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, কলিকাতায় বহুল ধনাঢ্য লোকের বাস, কাহারও না কাহারও দয়ার ভিখারী হইয়া স্বচ্ছন্দে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে। এই আশায়, বিশেষতঃ কলিকাতা-প্রবাসী কোন স্বদেশীয় ব্যবসায়ী লোকের আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বহু ক্লেশে পাথেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজধানী কলিকাতা নগরে আগমন করে। সেই সরলচিত্ত কিশোর বালক সংসারের কুটিল পথে কখন পদার্পণ করে নাই ; সকলকেই আপনার ন্যায় সরল জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল। যাহার কথায়

সে বুক বাঁধিয়া আশার কুহকে ঝাঁপ দিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার নিকটে নিরাশাপ্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ী কোমলপ্রাণ বালকের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল—কোন একটা উপায় নিরূপণ অবধি একটু থাকিবার স্থান দিয়াও উপকার করিল না। কলিকাতার ন্যায় অপরিচিত স্থানে এরূপ অল্পবয়স্ক বালক আশ্রয়াদি বিহীন হইলে কিরূপ কষ্টে পতিত হয়, তাহা এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অবগত হইতে পারে না। অগত্যা সেই হতভাগ্য বালক সহরের অনেক কৃতবিদ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির নিকট সাহায্য লাভার্থে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাগ্যহীন ব্যক্তির ভাগ্য কি সহজে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে? সে হয়ত কোথাও গিয়া দ্বারবানের তীব্র বাক্যবাণে ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, কোথাও বা প্রহরীবর্গের সানুগ্রহ ব্যবহারে দাতা মহাশয়ের চরণ সকাশে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্তোষজনক পরিচয় প্রদান করিতে না পারায়, হতাশ হইয়া স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার

দিতে দিতে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে দুই তিন দিন সামান্যমাত্র জলযোগ করিয়া তাহাকে পথে পথে কালক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যময়ী কলিকাতা নগরীতে লক্ষ্মীর অভাব ছিল না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনেক মহাত্মাই ধনের সদ্ব্যবহারও করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলি শঠ ও প্রতারকদিগের প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হইয়া অনেক দানশৌণ্ড ব্যক্তিও বিশেষরূপ পরিচয় না পাইলে কাহাকেও কিছু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন না। উক্ত বালকও বিশেষ সন্তোষজনক পরিচয় প্রদান করিতে না পারায়, কোথাও সফলমনোরথ হইল না। অবশেষে স্কুলের বালকদিগের নিকট হইতে বাড়ী যাইবার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে লাগিল। দুই একটী বিদ্যালয় পরিভ্রমণ করিয়া "ট্রেনিং স্কুলে" উপস্থিত হইল। তথায় আমাদের দানবীর যোগেন্দ্রনাথ তখন অধ্যয়ন করেন। অগ্নি যতই কেন প্রচ্ছন্নভাবে থাকুক না, বায়ুপ্রভাবে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে। কে কোথায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? আমাদের যোগেন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়া-

ছিল। তিনি যেমন গোপনভাবে সকল কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন, তেমনি সাহায্যপ্রাপ্ত বালকেরা সেই সকল প্রকাশ করিয়া ফেলিত। ঐ অনাথ দরিদ্র বালকের হৃদয়বিদারক কাতরোক্তি শুনিয়া অনেকেই সমর্থমত কিছু কিছু সাহায্য করিল এবং সকলেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যোগেন্দ্রনাথের নিকট আসিল। দয়াপ্রবণ যোগেন্দ্রনাথ বালকের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহার লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রথমে এ সকল কথা কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপনার খরচের টাকা হইতে তাহার বাসার বন্দোবস্ত, বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ও অন্যান্য সমস্ত খরচাদির বিধান করিয়া দিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত অন্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইল। উক্ত বালকের সমস্ত ব্যয়, নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় ও অন্যান্য বালকদিগকে মাসিক যাহা কিছু সাহায্য করিতেন, এই সমস্ত ব্যয়ভারে একবারে ভারগ্রস্ত হইয়া

পড়িলেন। সুতরাং বাটীতে না জানাইলে আর চলে না।

অগত্যা তিনি পিতার নিকট মাসিক সাহায্য বৃদ্ধি ও ঋণকৃত টাকার পরিশোধার্থে একখানি পত্র লিখিলেন। তাঁহার পিতা পত্র পাঠ করিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পত্রের উত্তরে টাকা না পাঠাইয়া এত অধিক ব্যয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। সাধারণতঃ ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা পাঠ্যাবস্থায় অর্থের অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইনি আবার অভিভাবক শূন্য হইয়া প্রলোভনপরিপূর্ণ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সকল নানা কারণ বিদ্যমান থাকাতেও তাঁহার পিতা স্পষ্টভাবে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কথা না বলিয়া ঐরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ পত্র পাঠ করিয়া আপনার যথাযথ খরচ ও উক্ত বালকটীর আদ্যোপান্ত বিবরণ সমেত সাহায্যদানের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া দিলেন। পিতা এই অল্পবয়স্ক সন্তানের দয়ালুভাব পরিজ্ঞাত হইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন

এবং তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত অর্থ প্রেরণ পূর্ব্বক আপনাকে সৎপুত্রলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই ঘটনাটী যখন ঘটে, তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। এরূপ অল্প বয়সে তিনি এত অধিক পরিমাণে স্বর্গীয় ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। অনেক ধনশালী দানবীর আছেন, যাঁহারা ইহাপেক্ষা আসন্নদশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন, জগতের হিতার্থে দেহমন বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, এরূপ উদাহরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যোগেন্দ্রনাথ দয়ার সেরূপ উচ্চ সোপানে অরোহণ করিতে নাই পারুন, তবে তাঁহাকে আমরা এই নিমিত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ দিই যে,তিনি এত তরুণ বয়সে পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিঃস্বার্থ দান কত আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার কোন উপায় নাই। কালসহকারে উক্ত বালক সুশিক্ষিত ও বহুল ধনে ধনবান হইয়া স্বদেশে অনেকগুলি নিরন্ন বালকের

অন্ন সংস্থান এবং বিদ্যা শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত থাকিয়া মহানগরী কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

যোগেন্দ্রনাথের এই অসামান্য দয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী অতি সুন্দর সর্ব্বজন-প্রশংসনীয় গুণ সমস্ত হৃদয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। সেটী তাঁহার অবিচলিত সত্যানুরাগ। তিনি মুখে সত্য সত্য বলিয়া সত্যবাদী হইতে চাহিতেন না; সত্য সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিয়া বা উপদেশ দিয়া সত্যানুরাগ প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত সাধুতা পরিলক্ষিত হইত। তিনি বাল্যকাল হইতেই যখন যাহার নিকট যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিতেন, তাহা যতক্ষণ না পালন করিতেন, ততক্ষণ কোন প্রকারেই নিরস্ত হইতে পারিতেন না। যেমন ভারবাহী ব্যক্তি আপনাদের নির্দ্দিষ্ট ভার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া না দিলে কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, সেইরূপ তিনিও অঙ্গীকৃত বিষয়টী যতক্ষণ না কার্য্যে পরিণত করিতেন, ততক্ষণ যেন তিনি কোন ভারে ব্যাকুল

হইতেন। এক সময় কোন সহপাঠী বালককে পুস্তক দিবেন বলিয়াছিলেন। অর্থের অস্বচ্ছলতা বশতঃ হউক, অথবা কোন কার্য্যগতিকেই হউক, তাহা দিতে বিলম্ব হইতে লাগিল; তাহার সহিত দেখা হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জিত হইতে লাগিলেন। একারণ নিজের পুস্তকখানি তাহাকে দিয়া যতদিন না বাটী হইতে টাকা আসিয়াছিল, ততদিন অপরের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এরূপ পরহিতৈষিতা এবং সত্যানুরাগ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অভ্যস্ত হইয়াছিল। এইরূপ চরিত্র লইয়া তিনি কৈশোরকাল অতিক্রম করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৈশোর কাল—বিবাহের সম্বন্ধ—রাজারামপুর নিবাসী মিত্রবংশ—গলসীনীর বসুবংশ—কৌলিন্য প্রথা—বিবাহ—শ্রীমতী অধরমণির বাল্য চরিত্র—পথের কষ্ট।

১২৫২ সাল হইতে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথের জীবনের একটী নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল; সুতরাং এই সময়ে তাঁহার জীবনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও স্থূলতঃ আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষে উন্নমিত হইয়াছেন। তিনি নিরীহ ভদ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই অতি বিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীবদ্ধ ছিল। তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার তৎকালীন ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া বোধ হইত, কালে ইনি আরও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি হইবেন। বাস্তবিক তিনি কোন এক ধর্ম্মবিশেষের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার পাঠ্যাবস্থা কালের একখানি রোজনামচা দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে,

তিনি সকল ধর্ম্মকেই অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন এবং যে ধর্ম্ম হইতে যে কোন সত্য পাইতেন, তাহাই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। তিনি মিতাহারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু কার্পণ্য কাহাকে কহে, তাহা আদৌ জানিতেন না। দয়ার পাত্র দেখিলে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত। নিয়তই পরদুঃখ মোচনে ব্যস্ত থাকিতেন। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশী সমূহের দুঃখ দূরীকরণে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইতেন। অপিচ ১২৫২ সালে তাঁহার অন্তর্নিহিত সদ্ভাব সকল বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইবার অবসর আসিয়া ঘুটিল। এই বৎসরে তিনি বিবাহ করিলেন।

অনেক উন্নতিশীল শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই বাল্য-বিবাহের নামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদের ইহা বুঝা উচিত যে, প্রচলিত বাল্য-বিবাহরূপ সামাজিক প্রণালীটী পরিণামচিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহার দোষগুণের পরিমাণ মানদণ্ডে তৌল করিয়া দেখিলে গুণভাগেরই গুরুত্ব

দেখা যায়। বাল্যকালে পূজনীয় পিতা মাতা যে দুইটী সরল হৃদয়ের ভাবী সৌভাগ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া একত্র সম্মিলিত করিয়া দেন, তাহারা যখন মুকুলিত অনুরাগপ্রভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে দুইটী নবীন সহকারমাধবীর ন্যায় পরস্পরের সাহচর্য্যে এক হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগের হৃদয় মধ্যে প্রণয়ের যে চিরস্থায়ী স্তর পড়িতে থাকে, বয়োধিকের বিবাহ প্রণালীতে কখনই তাহা হওয়া সম্ভব নহে। বয়োধিকের হৃদয়ের বৃত্তিনিচয় সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে পক্কতা লাভ করে। সুতরাং তখন দুইটীর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে এক না হইলেও হইতে পারে। এই জন্যই বলি, যদি দম্পতীর মধ্যে যথার্থ প্রণয়, শান্তি ও বিশুদ্ধ সুখ, মানবোচিত উদ্যম, তেজস্বিতা প্রভৃতি উৎপাদন করাই বিবাহের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হয়, তবে বাল্য-বিবাহ যে, বয়োধিকবিবাহ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। মহাত্মা জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক এই মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। দারিদ্র্য-দুঃখ বাল্য-বিবাহের একটী বিষময় ফল বটে, কিন্তু

সৌভাগ্যময়ী ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার অদৃষ্টে চিরপ্রসন্ন থাকায় তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

তিনি পুত্রের বিবাহ দিবেন স্থির করায়, চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকার সংবাদ সহ ঘটক আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে তাঁহারা যখন মেছুয়া বাজারের বাটীতে অবস্থিতি করেন, তখন বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত রাজারামপুর নিবাসী দেওয়ান রামানন্দ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত বিবাহের কথা হয়। তখন উক্ত কন্যার বয়স অল্প; সুতরাং কাহারও মত না হওয়ায় সকলে এক প্রকার নিরস্ত থাকেন। পরে পুনরায় বিবাহের নিমিত্ত নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; কিন্তু জগন্নাথ বাবুর একটীও মনোনীত হইল না। কোথাও হয়ত গঠন-প্রণালী সুন্দর, কিন্তু বর্ণ-জ্যোতি মনোজ্ঞ নয়; আবার যদি কোথাও গঠন ও বর্ণপ্রতিভা সুন্দর হইল, বয়সের অসামঞ্জস্য হওয়ায় প্রীতিকর হইল না। সুতরাং এইরূপে বহুস্থান হইতে আগত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এইরূপ অনেক পরিদর্শনের পর

বিধিনির্ব্বন্ধবশতঃ পুনরায় উক্ত রাজারামপুর নিবাসী দেওয়ান রামানন্দ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী অধরমণির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল।

যোগেন্দ্রনাথ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং ইহাঁকে লইয়া "কুল" করিতে হইবে। ঈশ্বরের কৃপায় এস্থলে সর্ব্বনাশকর কৌলিন্যপ্রথা বংশোচ্ছেদকারক তাহার দারুণ ভ্রূকুটী দর্শাইয়া ভীত করিতে পারিল না। এই দগ্ধপ্রায় বঙ্গভূমিতে কৌলিন্য প্রথার কারণ যে কত শত লজ্জাস্কর ঘৃণিত পাপ সকল উৎপন্ন হইয়া কত সম্ভ্রান্ত বংশকে চির-উৎসন্ন করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই ঘৃণিত রীতি প্রভাবেই অতি বিশুদ্ধ উদ্বাহ-সংস্কারও অতি কুৎসিৎ ব্যভিচার বেশ পরিগ্রহ করিয়া নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রেমকে অতি অপবিত্ররূপে পরিণত করিয়াছে। সেই পবিত্র বিবাহবন্ধন এমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন উহা অনেকের উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে ইহপরলোকের সর্ব্বনাশকর অধর্ম্মকে ধর্ম্মের নামে অভিহিত করিতে

কি সমাজের লজ্জা বোধ হয় না ? ধন্য দেশাচার ! ! এমন করিয়া আর কতদিন ছার দেশাচারের মায়ায় অন্ধ হইয়া অপূর্ণ মনুষ্যবিশেষের মনঃকল্পিত বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সেই মঙ্গলালয় ঈশ্বরের আজ্ঞা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবহেলা করিবে ? এরূপ কদাচার বিষয়ের অবতারণা করিতেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। বর্ত্তমান কালে এমন কোন যুক্তি দেখিতে পাই না, যাহার প্রভাবে এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কৌলিন্য প্রথা রক্ষিত হইতে পারে ; বরঞ্চ ইহার বিপক্ষে কত অত্যাচার চক্ষের উপর প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতেছে। যাহাতে এই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কুপ্রথা দেশ হইতে একবারে উন্মূলিত হয়, তজ্জন্য দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া থাকিলে হইবে না। পুত্রে পৌত্রাদির মঙ্গলকামনা করিয়া ইহার উন্মূলনে সকলে বদ্ধপরিকর হউন, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। সত্য চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এদিকে যেমন বিবাহের আমোদ আহ্লাদে গ্রাম আনন্দময় হইয়া উঠিল, দারুণ বর্ষাও সেই

সঙ্গে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দিনমণি দিবাকর মেঘাভ্যন্তর হইতে প্রকাশমান হইয়া আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে মেঘ, দশদিক অন্ধকারময় ও পথ সকল কর্দ্দমযুক্ত করিয়া প্রাবৃট্‌রাজ আপনার বিজয়-পতাকা উড়াইতে লাগিলেন। মেঘের গভীর গর্জ্জন, বিদ্যুল্লতার ক্ষণিক প্রভা এবং ভীষণ বজ্র-নাদ বিবাহের বাদ্যরোলের সহিত মিলিত হইয়া দিগ্বলয় শব্দায়মান করিয়া তুলিল। অনবরত মুসলধারে বৃষ্টিপাত হওয়াতে নদ নদী সরোবরাদি বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে সরিৎ-শাখা সকল ভীষণ বেগে কূলক্ষয় করিতে করিতে জনপদ সকল জলমগ্ন করিতে লাগিল। ময়ূর ময়ূরীগণ নবীন জলদাগমে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সুদৃশ্য পুচ্ছ-কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। প্রাবৃট্-বায়ু কদম্ব, কেতকী, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ তরুলতা সমূহের বিকসিত কুসুমাবলীর সৌগন্ধ হরণ করিয়া সলিলকণা সহ চারিদিকে বিতরণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে

কেকারব, কোথাও বা ভেকগণের কর্কশরব শ্রুত হইতে লাগিল ; নক্ষত্রগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমা আর গগনমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপে দুরন্ত বর্ষা ঋতু প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ক্রমে আনন্দজনক বিবাহকে নিরানন্দময় করিবার উপক্রম করিল। ধনাঢ্য জমিদার মহাশয়ের এই সর্ব্বপ্রথম পুত্রের বিবাহে নানাস্থান হইতে নাচ তামাসা ও বাদ্যাদি আসিয়া দীর্ঘকাল আমোদ চলিবে, ইহা অনুগত ব্যক্তিগণ বহুদিনাবধি আশা করিয়াছিল ; কিন্তু বর্ষার অত্যধিক উৎপীড়নে তাহাদের অন্তরে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। ক্রমে বর্ষার প্রথম আবেগ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে সকলেই নবীনতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আনন্দের একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

কলিকাতা ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানসমূহের এরূপ অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের সন্তান সন্ততির বিবাহ উপলক্ষে এত অধিক টাকা নাচতামাসা, বাজি প্রভৃতি অনর্থক বিষয়ে ব্যয় করেন যে, সেই সমস্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়া সাধারণের হিতার্থে কোন শুভকর কার্য্যে বিনিয়োজিত

হইলে বঙ্গদেশ কেন, আজ ভারতের নানাস্থানে গবর্ণমেণ্ট-সংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির বা অনাথ-চিকিৎসালয় সদৃশ কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎ-সালয় সংস্থাপিত হইত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কত শত লোক কৃতবিদ্য হইয়া স্বদেশ ও অন্যান্য দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধনে দীক্ষিত হইতেন; কত অনাথ আসন্নদশাগ্রস্ত ব্যক্তি সময়োচিত উপ-কার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলার্থে মঙ্গলময় বিভুর নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিত এবং সেই সকল কার্য্য সাধারণের ক্ষণিক সুখের কারণ না হইয়া চিরস্থায়ী সুখের নিদান হইয়া উঠিত। কিন্তু এই সদিচ্ছা তাঁহাদিগকে দেন, এমন হৃদয়-বান্ লোক ধনশালী মহাশয়দিগের মন্ত্রণাগৃহে সচরাচর স্থান পান না। তাঁহাদের আমোদপ্রিয় হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ সুমহান্ কার্য্যের বীজ উপ্ত করিতে কেহই সাহসী হন না। জগন্নাথপ্রসাদ যদি কাহারও উপযুক্ত পরামর্শ লইয়া এই বিবা-হোপলক্ষে রাশি রাশি অর্থ বৃথা আমোদে ব্যয় না করিয়া যথার্থ দেশহিতকর কোন কার্য্যে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে সেই সুখময় বিবাহের

উপর অতীতের স্তর যতই কেন পড়ুক না, আজও তাহা নূতনের ন্যায় আমোদ প্রদান করিত।

রাজারামপুর নিবাসী মিত্র মহাশয়েরা অতি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত ও বনিয়াদীবংশ। এই বংশের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়। ইহাঁদের প্রায় সকলেরই হৃদয়মন্দির বিশুদ্ধ ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত। সর্ব্বনাশকর পানদোষ কখনও ইহাঁদের পবিত্র বংশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মহাত্মা রামানন্দ মিত্র বর্দ্ধমান রাজসংসারে দেওয়ানী কার্য্য করিতেন। সুতরাং তিনি দেওয়ান বলিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার আটটী পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান হয়। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম রাধাগোবিন্দ, দ্বিতীয় গোপালগোবিন্দ, তৃতীয় বিজয়গোবিন্দ, চতুর্থ দোলগোবিন্দ, পঞ্চম জয়গোবিন্দ, ষষ্ঠ প্রাণগোবিন্দ, সপ্তম ধনগোবিন্দ ও অষ্টম প্রিয়গোবিন্দ। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমার নাম নবীনকিশোরী ও দ্বিতীয়ার নাম অধরমণি। ইহাঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। ইহাঁদিগের মধ্যে

চতুর্থ দোলগোবিন্দ বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীনাথ মিত্র, মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিকের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গিরিবালাকে বিবাহ করিয়া বর্ত্তমান মল্লিকবংশের মুখ্যতম সত্ত্বাধিকারী হইয়াছেন। ইনিও অতি সদাশয়, বিনীত ও শিক্ষিত এবং স্থানীয় লোক মণ্ডলীর প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নবীন-কিশোরী হুগলী জিলার অন্তর্গত খল্সিনী নিবাসী মহাত্মা দ্বারকানাথ বসুর সহিত বিবাহিতা হন। উক্ত পরিণয়ের নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ বসু অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগের সুমহান্ বংশের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। মহাত্মা চন্দ্রনাথ বাবু একজন সুশিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অধরমণি আন্দুল ও তৎপ্রাকন্তী গ্রাম সমূহের এবং মল্লিক সংসারের লক্ষ্মীশ্রী হইয়া মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথের অঙ্কশায়িনী হন। ইনি যেমন পরম রূপবতী, সেইরূপ স্বামীর সহিত তুল্য প্রকৃতিবিশিষ্টা। পরের

জন্য এ রমণীর হৃদয় স্বতঃই কাঁদিয়া উঠে। এমন কি, তিনি পরের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত আত্মসুখ বিসর্জ্জনেও বিমুখ হন না। ঈশ্বর যোগ্যের সহিত যোগ্যের সম্মিলন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতেই স্বামীর হিতকর কার্য্যকলাপে সহানুভূতি দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না। যিনি ইহাঁর স্বাভাবিক সৌম্যভাব ও শিষ্টাচার একবার প্রত্যক্ষ করিবেন, তিনিই ইহাঁকে শ্রদ্ধা না করিয়া কোন ক্রমেই নিরস্ত হইতে পারিবেন না। রমণী-স্বভাব-সুলভ দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, গুরুজনের সেবাশুশ্রূষা ও অকৃত্রিম স্বামীভক্তি প্রভৃতি গুণ-নিচয়ে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র নিয়তই বিভূষিত।

যখন শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথের সহিত শ্রীমতী অধরমণির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়, তখন অধর-মণির বয়স একাদশ বৎসর মাত্র। উভয়ের বয়সে দুই বৎসরের পার্থক্য ছিল। সুতরাং বয়সের সামঞ্জস্য উপযুক্ত হইয়াছিল। মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের উন্মুখেই উভয়ের হৃদয় একত্র হইয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর সমবয়স্কতা যেমন উভয়ের প্রেমাধিক্যের কারণ

হইয়া উঠে, তেমনি তাহাদের বয়ঃক্রমের অধিক ন্যূনাধিক্য ঘটিলে বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। মনুষ্যের যেমন দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে তাহার শরীর ও মনের অবস্থাও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয়। এইজন্য সমবয়স্ক প্রণয়ী-যুগলের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি যেরূপ একত্র মিশ্রিত হইয়া অধিকতর প্রণয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটিলে প্রণয়ের সেরূপ গাঢ়তা পরিলক্ষিত হয় না।

ভর্ত্তা ও ভার্য্যার বয়ঃক্রমের বিপর্য্যয় ঘটিলে কেবলমাত্র যে সুচারু বয়স্যভাব সমুৎপন্ন হয় না, তাহা নহে। ইহাতে আর একটী ভয়ানক অনিষ্টের সুত্রপাত হইয়া থাকে। পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক গতি বিভিন্ন প্রকার হইলে তাহাদের সন্তান সন্ততিও সুলক্ষণসম্পন্ন নির্দ্দোষ-প্রকৃতি হয় না। সুতরাং এক বিবাহ-প্রণালীর অবিশুদ্ধতায় চিরন্তন বংশগৌরবের অপলাপ হইয়া থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা বহুকালাবধি এই সর্ব্বনাশকর কুরীতি-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া চক্ষের উপর কত অনিষ্ট

প্রত্যক্ষ করিতেছি ; তথাপি এই কুপ্রথারূপ বিষম পাপের আংশিক প্রতীকারের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টাও করি না। যেন একেবারে অটল অচল হিমাচলের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছি। ভ্রমেও ভাবিতেছি না যে, পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের সুখ সৌভাগ্যের নিমিত্ত অশেষ উপায় অবলম্বন করিলেও উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় অধিকতর অবনতির দশায় নিপতিত হইয়া একবারে উৎসন্ন যাইব। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সরলহৃদয় যোগেন্দ্রনাথকে এরূপ কুফলজনক বিবাহপ্রণালীর দারুণ আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই।

বলা বাহুল্য যে, এই বিবাহ বর্দ্ধমানে সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পরদিন সকলে আন্দুলাভিমুখে রওনা হইলেন। রাজারামপুর যাইতে হইলে পথে দামোদর নদ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। বর্দ্ধমান যাইবার কালে দামোদর যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, আসিবার সময় দেখা গেল যে, সেই দামোদর আরও উগ্রতর মূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূভাগ গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। গমনকালে যে স্থান বিশ্রামলাভের স্থান ছিল, এখন সেই স্থান দামোদরের সর্ব্বগ্রাসী উদর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। তাহার দুর্দ্দমনীয় অবিরাম গতির ভীষণ বেগে তীরস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, কৃষকবৃন্দের বহুযত্নে রক্ষিত পর্ণকুটীর ও তাহাদিগের জীবনোপায়ের একমাত্র অবলম্বন গো সকলের জীবনোপায় তৃণরাশিপ্রভৃতি তৃণখণ্ডের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথাও তীরস্থ বালুকাস্তূপ নদীগর্ভে বিলীন হইতে লাগিল; কোথাও বা সমতল ভূমিখণ্ড হঠাৎ গভীর খাদে পরিণত হইয়া বহুসংখ্যক জীব জন্তুর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিল।

বিবাহের পর দ্বিতীয় দিন বর্ষার প্রকোপে পথের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল যে, বাহকেরা আসিতে আসিতে যানসহ বরকে কর্দ্দমে পাতিত করে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাতে বরকে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। কিন্তু ইহাতে নিরীহ যানবাহিদিগের অদৃষ্টে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল। স্নেহপ্রবণ জগন্নাথ বাবু পুত্রস্নেহে একেবারে অন্ধ

হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্দ্দোষী বাহকগণের উপর পীড়ন করিতে লাগিলেন। পিতার এই অবৈধ ব্যবহারে দয়াল-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ভয়ে স্বয়ং পিতার নিকট কোন কথা বলিতে না পারিয়া বরযাত্রীয় কোন ভদ্রলোককে তাহাদের মুক্তির নিমিত্ত বিবিধ প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। উক্ত ভদ্রলোকটী বিশেষরূপ অনুরোধ করাতে, তাহারা মুক্তিলাভ করে। সেই দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদিঘীর হরিসিংহ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। একে পথ পর্য্যটনের বিষম কষ্ট, তদুপরি পূর্ব্ব দিনের অনিদ্রাজনিত শরীর- গ্লানি, তৎসঙ্গে আহারের অনিয়ম প্রভৃতি কারণে, সকলেই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ঐ দিবস তাঁহারা উক্ত সিংহ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিলেন। হরি বাবুর সহিত উক্ত মিত্র মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যথোচিত আগ্রহের সহিত ইহাঁদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

পর দিবস অর্থাৎ বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলিপুর গ্রামে কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীতে সদলে উপস্থিত হন। উক্ত কবিরাজ মহাশয় মল্লিক বাবুদের বাটীর গৃহচিকিৎসক ছিলেন; সুতরাং জগন্নাথ বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে বরযাত্রীগণ ঐ দিবস তাঁহারই বাটীতে অবস্থান করেন। বিবাহ রাত্রি হইতে ঐ দিন মনুষ্য-জীবনের একটী উৎসবের দিন। এই অতুল আনন্দদায়ক উৎসবের নাম কাহারও হৃদয়ে জাগরিত হইল না। সকলেই আহারাদির পর পথপর্য্যটনের ক্লান্তিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ-প্রসাদ সহসা বলিয়া উঠিলেন যে, "আজ ফুল-শয্যার দিন, কাহাকে বল, যেন বর-ক'নের শয্যায় কিঞ্চিৎ ফুল দেওয়া হয়।" এই কথা শুনিয়া উক্ত হরনাথ কবিরাজ মহাশয়ের অল্পবয়স্কা পুত্র-বধূ অনেক অনুসন্ধানের পর কোথাও কোন পুষ্প প্রাপ্ত না হওয়ায় অগত্যা বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা

পচা পুখুর হইতে গোটাকত কলম্বী পুষ্প আনিয়া বরের শয্যায় দিয়া গেলেন। এইরূপে সৌগন্ধ পরিপূর্ণ কলম্বী পুষ্প লইয়া নব-প্রণয়িণীর সে রাত্রি অবসান হইল। পরদিন তাঁহারা নির্ব্বিবাদে আন্দুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে বর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বাড়ীর সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। দূরস্থ আত্মীয় ব্যক্তির প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিলে সাধারণতঃ মনোমধ্যে নানাবিধ কু-চিন্তা আসিয়া থাকে, বিশেষতঃ বর্ষার আতিশয্য, তদুপরি দামোদরের প্রচণ্ড বন্যা। প্রায়ই ইহার ভীষণ স্রোতে শত শত লোকের অমূল্য জীবনকে গ্রাস করিয়া থাকে। এইরূপ নানা প্রকার কু-চিন্তা আসিয়া স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-প্রাণকে সহজেই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইয়া আনন্দময় সোনার সংসারকে যেন একবারে দুঃখ-ময় করিয়া তুলিল। এমন সময় আনন্দের তুফান তুলিতে তুলিতে মহাসমারোহের সহিত দম্পতী বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর আহ্লাদের ইয়ত্তা রহিল না; সকলেরই

বদনে প্রসন্ন ভাব প্রকাশ পাইল। যাঁহারা ক্ষণকাল পূর্ব্বে কাল্পনিক অমঙ্গলের ভাবনায় অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছিলেন, এখন দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সেই শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল। নিরানন্দময় বিষাদ-চ্ছায়া কোথায় পলাইয়া গেল। ইহার পর পাঁচ ছয় দিন ব্যাপিয়া নব-বধূর পাকস্পর্শ-জনিত মহা সমারোহ ব্যাপার চলিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ভোজন, অতিথি-অভ্যাগত-সৎকার, কাঙ্গালী ভোজন ও বিদায় প্রভৃতি কার্য্য অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাল্য-প্রকৃতি—শ্রীমতী অধরমণির সুশীলতা—যোগেন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা—অস্মদ্দেশের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—মিশনরী মহাত্মাদিগের ব্যবহার—বিদ্যালয়ের উন্নতি—নামকরণ—বিদ্যালয়ের সম্পাদক পরিবর্ত্তন—জুবিলী স্কুলের উৎপত্তি ও বিনাশ—কুণ্ড বাবুদের হস্তে বিদ্যালয় সমর্পণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুধীর যোগেন্দ্রনাথ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া সুখময় যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। গগনমণ্ডলে চন্দ্রোদয় হইলে প্রদোষকাল যেমন রমণীয়তা সম্পাদন করে ও কুসুমোদ্গমে কল্পবৃক্ষ যেরূপ অপূর্ব্ব শ্রী পরিগ্রহ করে, যৌবনোন্মেষে যোগেন্দ্রনাথও সেইরূপ বিমল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয়তা ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল ক্রমশঃ বিশাল ও সমুন্নত হইল; উরুদ্বয় মাংসল, ভুজযুগল সুদীর্ঘ ও স্কন্ধদেশ উন্নত হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহাকে

দেখিলে প্রকৃত বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হইত। একটী চলিত কথা আছে,—"বিবাহের জল পাইলে মানবের দেহজ্যোতিঃ অধিকতর সৌন্দর্য্য-শালী হইয়া থাকে।" আমাদের এই নব দম্পতীর পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। যাই হৌক্, বিবাহের পর যোগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যা শিক্ষার্থে পুনরায় কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

অনেকেরই মত, বাল্যকালে বিবাহ দিলে বালকেরা প্রায়ই বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী হইয়া থাকে; অত্যধিক বিলাসপ্রিয় হইয়া নিয়তই শারীরিক সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসী অনেক ধনকুবেরদিগের পুত্রগণকে প্রায়ই উক্ত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। চরিত্রবান্ যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ক্ষেত্র এরূপ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় নাই। তিনি ধনী ব্যক্তির আদরের সন্তান ছিলেন বটে; কিন্তু এক দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে অযথা অহঙ্কার প্রকাশ করিতে দেখে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে বিলাসিতার একশেষ প্রদর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার চিত্তক্ষেত্র এরূপ

নিস্পৃহতার আধার ছিল যে, বিলাসদ্রব্য তাঁহার চক্ষুশূল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যোগেন্দ্রনাথের প্রকৃতি নিয়তই বিলাসের প্রতিকূলে যাইত। তাঁহার এরূপ হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি স্বজাতীয় রীতিনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ের একটী জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁহার জীবনের মধ্যাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। যথাসময়ে তাহার সমাবেশ করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

এই সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে যেমন বৎসরে দুইবার বাটী আসিতেন, এখনও সেইরূপ নিয়মে বাটী আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অন্য সময়ে বাটী আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেও বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিতেন না। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যেমন তাঁহার আগ্রহ ছিল, সেইরূপ তিনি নম্রতা ও সহিষ্ণুতাদি গুণেও ভূষিত ছিলেন। যদি কোন দিন কোন কার্য্যগতিকে রন্ধনাদির বিলম্ব হইত, তাহাতে কাহারও উপর ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হওয়া

দূরের কথা, বরং তিনি অম্লান বদনে সামান্য "ভাতে ভাত" মাত্র উপকরণ অবলম্বনে আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিতেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যোগেন্দ্র নাথের আর দুইটী সহোদর ছিলেন। যখন যোগেন্দ্রনাথের বয়স সাত বৎসর, তখন শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন। পাঁচ সাত বৎসরের বালকের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, সে ভবিষ্যতে কিরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিবে।

নগেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি চঞ্চলস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। নিয়তই ক্রীড়া প্রভৃতি আমোদজনক কার্য্যে জীবনের অমূল্য সময়কে বৃথা ক্ষেপণ করিতেন। যখন ইহাঁর বয়স ছয় বৎসর, তখন যোগেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। যোগেন্দ্র বাবুর বিবাহোপলক্ষে যে সকল অনাহূত অতিথি ও নীচকুলোদ্ভব কাঙ্গালী আসিয়াছিল, তিনি তন্মধ্যে কতকগুলিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সকলের চিঠি আছে?" তাহারা

বালক দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কেহ বলিল চিঠি আছে, কেহ বলিল চিঠি নাই। যাহারা চিঠি আছে বলিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি অতি যত্নের সহিত এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বসাইলেন; আর যাহারা চিঠি নাই বলিয়াছিল, তাহাদিগকে অপর পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া প্রহার করাইলেন। তাহারা ব্যাকুল হইয়া কর্তৃপক্ষকে অবগত করাইলে তবে তিনি নিবৃত্ত হন। নগেন্দ্র বাবু ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে বার তের বৎসরে উন্নমিত হইলেন বটে, কিন্তু তদনুরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহাকে যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহাঁর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল; যে বিষয় একবার দেখিতেন বা অধ্যয়ন করিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কথিত আছে, যে দিন তিনি মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করিতেন, সে দিন শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন না। এজন্য উপযুক্ত বিদ্যা লাভ

করিয়া আপনার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিতে পারেন নাই। যদিও বালস্বভাব-সুলভ চঞ্চলতাবশতঃ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিকে সকল সময়ে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার চরিত্রে একটী মহান্ গুণ ছিল, যে গুণ সকল দোষকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার জীবনকে সংসারের অশেষ সুখের কারণ করিয়া তুলিয়াছিল,—তাহা অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম। অগ্রজের নিকট বিনয় ও শিষ্টাচারের একশেষ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং যখন যাহা আদেশ করিতেন, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিতেন না। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। অধিক কি, নগেন্দ্র বাবু বাল্যাবস্থায় ভ্রাতৃবৎসলতার আদর্শ ছিলেন, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে কেবল অগ্রজেরই প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার প্রতিও তাঁহার যথাযুক্ত ব্যবহারের অপচয় লক্ষিত হইত না। লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র ও সীতা দেবীর প্রতি যে

অমানুষেয় ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া জগতে ভ্রাতৃপ্রেমের উপমাস্থল হইয়াছেন, নগেন্দ্র বাবুও বাল্যাবস্থায় সেইরূপ যোগেন্দ্রনাথের ও অধরমণির প্রতি সৌভ্রাত্র প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, শেষ অবস্থা অবধি সে ভাব তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। যোগেন্দ্র বাবুর জীবন-নাট্যের শেষ অধ্যায়ে নগেন্দ্রনাথ স্বীয় অবিবেকিতা বশতই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ভ্রাতৃপ্রেমরূপ দুশ্ছেদ্য গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্যক্ বিরূপ হইয়াছিলেন। কাল সহকারে এই ভ্রাতৃবিরোধ এরূপ বর্দ্ধিত কলেবর ধারণ করিয়াছিল যে, মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বামীশোক-প্রপীড়িতা সুদুঃখিতা অধরমণিকেও উত্যক্ত করিতে তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। হায়! অর্থের কি মায়াবিনী শক্তি! ইহার প্রভাবে অতি চরিত্রবান্ ব্যক্তিও সময়ে সময়ে স্খলিতপদ হইয়া ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলেন। অপরিশোধ্য মাতৃ-পিতৃ-স্নেহ, অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম, মধুময় বন্ধুত্বের স্বর্গীয় প্রীতি ও সংসার-গ্রন্থিস্বরূপ

অতুলনীয় প্রেমের আধারভূতা সাধ্বী স্ত্রীর কমনীয়ভাব এ সকলই অর্থাসক্তির জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধীভূত হইয়া যায়। অধিক কি, সময়ক্রমে মনুষ্য-হৃদয় এত দূষণীয় হইয়া উঠে যে, যে মানব জগৎ সৃষ্টির মুখ্যতম লক্ষ্য, সে দারুণ অর্থ-লালসায় অরণ্যচারী জন্তু অপেক্ষাও হেয় ও অপদার্থ হইয়া উঠে। তাহারাও তাহাকে দেখিয়া সভয়ে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বর্ষাগমে আন্দুল হইতে রাজারামপুর যাইবার পথ অতি দুর্গম হইয়াছিল। তখন এখনকার ন্যায় "রেলওয়ে" ছিল না; সুতরাং যাতায়াতের বড় কষ্ট হইত। তন্নিমিত্ত জগন্নাথপ্রসাদ বাবু বিবাহোৎসব সমাধার পর নব-বধূকে রাজারামপুরের বাটীতে পাঠাইলেন না। অগত্যা সুশীলা অধরমণিকে প্রথমেই ছয় মাস কাল শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। একাদশ বর্ষ বয়স্কা অধরমণি এরূপ সুশীলা ছিলেন যে, সম্পূর্ণরূপ অজানিত ও অপরিচিত আত্মীয়গণের মধ্যে থাকিয়া যেন চিরপরিচিতার

ন্যায় কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কখনও কাহারও প্রতি একটী উচ্চ কথা বলিতেন না। সকলকেই বিনয় ও মধুরবাক্যে সন্তুষ্ট এবং প্রিয়াচরণ দ্বারা সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। দেবর ও ননন্দৃবর্গের প্রতি কখন তিনি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। সদ্বংশসম্ভূতা মহিলার পক্ষে যে সকল গুণ সম্ভবে, তাঁহাতে তাহার কিছুমাত্র অভাব লক্ষিত হইত না। তাঁহার বালিকাবস্থায় যেরূপ দানশীলতা, দয়ালুতা, শিষ্টাচারিতা ও নম্রতা লক্ষিত হইত, সচরাচর সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। গুরুজনের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। একদা তাঁহার শ্বশ্রূদেবী কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন যে, "সকলে যাহা করিবে, তুমি তাহা করিতে পারিবে না, যাত্রা নাচ তামাসা দেখিতে যাওয়া তোমার উচিত নয়।" এ কথাটী তাঁহার মনে নিয়ত জাগরূক ছিল; এ নিমিত্ত কোন উৎসব উপলক্ষে বাটীতে নাচ তামাসা প্রভৃতি আমোদজনক কার্য্য হইলে বাটীর সকল বধূরা দেখিতে যাইতেন; কিন্তু তাঁহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেও তিনি যাইতেন

না। বাল্যকাল হইতে তিনি সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। এইরূপ ছয়মাসকাল অতিবাহিত করিয়া পিত্রালয়ে গমন পূর্ব্বক তথায় বৎসরেক মাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনরায় আন্দুলের বাটীতে শুভাগমন করেন। এই সময়ে জগন্নাথ বাবু কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্ত্রী-পুত্রসহ কলিকাতায় অবস্থিতি করেন; সুতরাং গুণবতী অধরমণি অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত আন্দুলের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অধরমণির স্নেহমাখা লাবণ্যমাধুরী দেখিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রবাহিত হয় নাই, এরূপ লোক আন্দুলে অতি অল্পই ছিল। সুতরাং আত্মীয়েরা সকলেই যে তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেন,তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি এক বৎসরকাল আন্দুলে রহিলেন। ইতিমধ্যে আন্দুল ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানসমূহে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। দুরন্ত বসন্তের অত্যধিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আন্দুলের অনেকেই স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের মাতৃস্থানীয়া অধরমণিও কলিকাতায় গমন করিলেন। বৎসরেককাল

তথায় অতিবাহিত করিয়া যোগেন্দ্র বাবু ব্যতীত সকলেই আন্দুলের বাটীতে পুনরাগমন করেন।

১২৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে মহাত্মা যোগেন্দ্র নাথ হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বিদ্যালয় হইতে অবকাশ গ্রহণান্তর আন্দুলের বাটীতে আগমন করেন। এক্ষণে তিনি পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপায় ও চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের বাটীতে কোন কার্য্যবিশেষে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। সেই উপলক্ষে বহুসংখ্যক বালক-বালিকা সমাগত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটী বালকের প্রতি সহসা তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া নানারূপ কথার অবতারণার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি লেখাপড়া কর?" তাহাতে তাহারা বলিল, "আমরা পূর্ব্বে কলিকাতায় পড়িতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে পিতার হীনাবস্থা প্রযুক্ত এক প্রকার বসিয়া আছি। মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যদি প্রত্যহ আমার নিকট পড়িতে

আসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের পড়িবার যাবতীয় ভার নির্ব্বাহ করিতে পারি।" বালকেরা তাঁহার অভাবনীয় দয়ার কথা শুনিয়া আনন্দে গদগদচিত্ত হইয়া পরদিন হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত আসিতে লাগিল। তিনি যতদিন বাটিতে ছিলেন, ততদিন তাহাদিগকে তাহাদের উপযুক্ত বস্ত্র, সময়ে সময়ে তাহাদিগের আহারাদির খরচ ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রদান করিয়া যথোচিত আগ্রহের সহিত অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। ক্রমে তাঁহার অবসর কাল অবসন্ন হইয়া আসিল, অগত্যা তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদের নিমিত্ত ভাল ভাল অর্থপুস্তক অভিধান প্রভৃতি ক্রয় করিয়া যাহাতে তাহারা নিজে পড়িতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা একমাস কাল এরূপ ভাবে পড়, আমি আশ্বিন মাসে আসিয়া তোমাদের ইহাপেক্ষা ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব"; তাহারাও তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আশ্বিন মাস সমাগত হইল। কাল কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া চলে না। যে তাহার সদ্ব্যবহার করে, তাহারই সে বন্ধু হয়; যে তাহার অপব্যবহার করে, তাহারই সে শত্রু হয়। কালের সহিত বন্ধুতা স্থাপন না করিলে সে আমাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যায় এবং তখন আমরা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। যোগেন্দ্রনাথ কালের অপব্যবহার করিবার লোক ছিলেন না, তাই আজ আন্দুলের ঘরে ঘরে আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে অজস্র অশ্রুপাত করে; তাই তিনি আন্দুলবাসীগণের হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি প্রস্তরাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় খোদিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নিয়তই ভাবিতেন যে,'কি প্রকারে মঙ্গলাবহ একটী বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিবেন, পিতাকে বলিলে তিনি যদি তাঁহার মতের পক্ষ সমর্থন না করেন, তাহা হইলেই বা কি করিবেন; যখন বালকদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি পুনরায় আসিয়া তাহাদের একটা সুবন্দোবস্ত করিবেন, তখন তাঁহার পক্ষে অবশ্য একটা কিছু বন্দোবস্ত করা বিধেয়। তবে

তাহাতে অন্যান্য বালকের উপকার হইলে বিশেষ আহ্লাদেরই বিষয় হইবে।’ ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক যুবার দয়াপ্রবণ হৃদয় আন্দুল ও তৎপার্শ্বস্থ গ্রাম-সমূহের অজ্ঞানান্ধকার অপনয়নের জন্য কাঁদিয়া উঠিল; ইহা কম আনন্দের বিষয় নয়। তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া পূজাবকাশে আন্দুলাভিমুখে আগমন করিলেন। তাঁহার তৎকালীন কার্য্যকলাপ অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, স্বদেশের জন্য তাঁহার হৃদয় বাস্তবিকই কাঁদিয়াছিল। তিনি বাটীতে আসিয়াই সেই বালকদ্বয়কে সংবাদ দিলেন; তাহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিলেন; বালকদ্বয়ও পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিল এবং তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল; সুতরাং সন্তোষজনক পরীক্ষা দিয়া তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই সময়ে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

মন্ত্রগুপ্তি তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। এজন্য তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সর্ব্বপ্রথম এরূপভাবে পরিচালিত হইত যে, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারিত না; পরে যখন তাঁহার কার্য্য সফলতা লাভ করিত, তখন সর্ব্বসাধারণে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য জানিতে পারিত। এ কার্য্যেও তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয় নাই। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি ঐ দুইটী বালককে প্রীতি করেন, তাই তাহাদিগকে এত আগ্রহসহ-কারে অধ্যাপন করেন। পরে সকলে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রীতি ঐ দুইটী বালকেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

অগ্নি কতক্ষণ বস্ত্রাবৃত থাকে? অনুকূল বায়ু প্রভাবে তাঁহার অধ্যাপনার কথা শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি তাহা-দিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তক অবধি স্বীয় ব্যয়ে ক্রয় করিয়া দিতে লাগিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদের বসিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বেঞ্চ ও গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং প্রত্যহ যাহাতে

সুপ্রণালীক্রমে অধ্যাপনা কার্য্য সমাধা হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি পূজাবকাশ শেষ হওয়া অবধি স্বয়ং দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে, তাহাদের অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি স্নান ও জলযোগের পর বেলা দশ ঘটিকা হইতে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়া এক ঘটিকা অবধি তাহাতে নিযুক্ত থাকিতেন। পরে একটার পর মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিতেন। সেই সময়ে বালকদিগেরও জলযোগের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহারা জলযোগের পর, অর্দ্ধ ঘটিকাকাল আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিত। তিনিও সেই অবকাশে কথঞ্চিৎ শান্তিসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বক চারি ঘটিকাবধি বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন। এইরূপ অবিচলিত অধ্যবসায় ও দৃঢ়তর যত্নসহকারে অধ্যাপনাকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যিনি আজন্মকাল সুখের দোলায় লালিত পালিত হইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতেন, তিনি আজ পরোপকারার্থে ও স্বদেশের হিতসাধনার্থে প্রখর গ্রীষ্মতাপে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অপরিমেয় পরিশ্রম করিতেও বিন্দুমাত্র

ক্লেশ বোধ করিলেন না। ধন্য তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও ধন্য তাঁহার বিদ্যানুরাগ।

তাঁহার এবম্ভূত অবিচলিত স্বদেশপ্রিয়তা দেখিয়া অস্মদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের মহানুভাবতার ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিশনরী মহাত্মাদিগের মহাপ্রাণতার বিষয় হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত হইয়া মানসপদ্মকে প্রস্ফুটিত করিতে থাকে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই পঠদ্দশায় বহুকালাবধি প্রবাসে থাকিয়া আত্মীয় স্বজনের বিরহ ও আহারাদির অপরিসীম কষ্ট ভোগ করিয়া অমূল্য বিদ্যাধন লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই দুর্লভ বিদ্যাধন অকাতরে বিতরণ করিবার নিমিত্ত জগতের সকল কর্ম্ম উপেক্ষা করতঃ একান্ত অন্তঃকরণে তাহাতেই নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করেন। নানা প্রকার সাংসারিক কষ্ট পরিবারগণকে প্রপীড়িত করিতেছে, ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আদৌ সঞ্চালিত হয় না, কেবল মাত্র বিদেশাগত ছাত্রবৃন্দকে

অক্ষুব্ধচিত্তে অন্নদান পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে পারিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হন; তাঁহারা যেন জগতের লোকদিগকে দয়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি নিচয় শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দেশহিতৈষী মহাপুরুষ-দিগের আসনপার্শ্বে আমাদের যোগেন্দ্রনাথকে বসাইলে তাঁহাদের লোকবিশ্রুত যশের অপচয় হয় না। তিনি বিদেশে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বাটীতে সেই বিদ্যদান করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী পিতার সর্ব্বপ্রথম পুত্র হইয়াও ভোগসুখাভিলাষ-রহিত হইয়া অপরিমেয় পরিশ্রমসহকারে স্বয়ং চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়দিগের ন্যায় বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

অনেক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিশনরী মহাত্মার ব্যব-হার অবলোকন করিলে মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময়ের সহিত অনুরাগ ও ভক্তির উদ্রেক হয়। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অজ্ঞ ও অসভ্য লোকদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যাদান করিবার নিমিত্ত যেরূপ প্রচুর অর্থব্যয়, অশেষবিধ পরি-শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাতে

তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি না করিয়া কোন প্রকারে থাকিতে পারা যায় না। তাঁহাদিগের ন্যায় মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথেরও কার্য্যপ্রণালী লোকহিতকামনারূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত সাধুহৃদয় মহাপুরুষদিগের ন্যায় বালকদিগের আবশ্যকমত পুস্তক ও খাদ্যাদি দিয়া শিক্ষাদান-প্রযত্নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র নিয়তই এহেন সাধুকার্য্য সাধনে জাগরূক থাকিত। সে সময়ে যে কোন ব্যক্তি বিদ্যালয় বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিতেন, তিনি তাহা আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন। তখন ইহাই তাঁহার আনন্দ লাভ করিবার একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

ক্রমে তাঁহার বিদ্যালয়ের অবকাশ অবসান হইয়া আসিল; সুতরাং তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। একারণ একজন উপযুক্ত শিক্ষকের আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর আন্দুল রায়পাড়া নিবাসী বাবু রামচাঁদ রায়ের পুত্র বাবু মতিলাল রায় মহাশয়কে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষকের

নিয়মিত বেতন ও বালকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। তিনি এই সময় হইতে সপ্তাহ অন্তর বাটী আসিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মাসে মাসে পরীক্ষা করিয়া নূতন পুস্তক ধরাইতেন। তাঁহার এইরূপ অবিচলিত যত্ন ও মতি বাবুর অপরিমিত পরিশ্রম প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বদেশ-বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ গ্রীষ্মাবকাশে বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩০ জন হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মতি বাবুর সহিত তিনিও কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

দারুণ নিদাঘ কাল—আহারাদির পর গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য। সহস্রকর দিনমণির অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ প্রখর কিরণমালা সর্ব্বসংহারক কালের ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে যেন ভস্ম করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ করিতেছে। চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিতেছে—বোধ হইতেছে, যেন

দিঙ্মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে দগ্ধ হইতেছে। পক্ষীগণ নিস্তব্ধ হইয়া বৃক্ষের ঘন পল্লবমধ্যে আত্মশরীর গোপন করিয়া অবস্থিতি-করিতেছে। আর কোন শব্দই শ্রবণগোচর হয় না। বৃহদাকার মহিষকুল পঙ্কশেষ পল্বলে আপন শরীর আচ্ছাদিত করিয়া নিশ্বাসচ্ছলে নিজেদের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কুকুরগণ বারম্বার লোলজিহ্বা বাহির করিতেছে। গ্রীষ্ম প্রভাবে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া অনলের ন্যায় গাত্রে লাগাতে গাত্র হইতে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। এমন কষ্টপ্রদ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সময়ে কোমলকায় যুবা যোগেন্দ্রনাথ প্রকৃতির সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার অভিপ্রেত সুমহান্ কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এরূপ সময়ে জমিদার পুত্র-গণ স্বভাবতই নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে শায়িত হইয়া শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ইনিও ইচ্ছা করিলে তাহাই করিতে পারিতেন, অথবা বন্ধু-বান্ধবসহ আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ বা বিষয়াদি পরিদর্শন প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে সময়াতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু এ প্রবৃত্তি

পরহিতাকাঙ্ক্ষী দয়াপর যোগেন্দ্রনাথের হৃদয় মন্দিরে স্থান পায় নাই। মধ্যাহ্ন কালীন প্রখর সূর্য্যকিরণে ঈদৃশ গুরুতর পরিশ্রম করায় পাছে তাঁহার কোন প্রকার পীড়া হয়, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও অন্যান্য গুরুজন তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় কিছুতেই প্রশমিত হইল না। দিন দিন অভীষ্টসিদ্ধি নিকটবর্ত্তী উপলব্ধি করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সুখশয্যায় লালিত ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক যোগেন্দ্রনাথ স্বদেশের একটী প্রধান অভাব বুঝিয়াছেন; স্বয়ং অশেষ সুখের অধীশ্বর হইয়া এরূপ অল্পাদপি অল্প বয়সে অভাবগ্রস্ত নিরন্ন ব্যক্তির হৃদয়ব্যথা জানিতে পারিয়াছেন ও বিলাস দ্রব্য সমূহে পরিবৃত থাকিয়াও নিস্পৃহ সংসারবিরাগীর ন্যায় স্বদেশীয় জনসাধারণের উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, ইহা কি অল্প সৌভাগ্যের কথা? ইহা পরমপিতা পরমেশ্বরের অযাচিত করুণা।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার অবকাশ শেষ হইয়া

আসিল। ঈশ্বরের কৃপায় এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫ জন হইয়াছে। সুতরাং আরও দুই একটী গৃহ ও শিক্ষকের আবশ্যক হইয়া উঠিল। খৃঃ ১৮৪৮ তিনি আরও তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া “আন্দুল ভার্ণাকুলার স্কুল” এই নামে বিদ্যালয়টীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গবাসীগণ অনেকেই কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সময় অত্যধিক আড়ম্বরের সহিত তাহার সূচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রমে যতই দিন গত হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি ঔদাস্য ও আলস্য প্রকাশ পাইতে থাকে। পাছে তাঁহার এই যত্নের ধন অনাদরে পড়িয়া শোচনীয় দশায় পতিত হয়, একারণ যোগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গমন কালে উক্ত চারিজন শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় প্রভৃতির সুচারু ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। দুই একমাস পরে ছাত্রসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়ায় বহির্ব্বাটীতে আর স্থান হইল না, সুতরাং তিনি বাড়ী আসিয়া বিদ্যালয়টীকে তাঁহাদের বৃহদাকার পূজার দালানে স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় ছাত্রসংখ্যা

একশত ত্রিশজন হইল, তখন তিনি রীতিমত স্কুল পরিচালন নিমিত্ত আরও অধিক বেঞ্চ ও টেবিল প্রস্তুত করাইলেন এবং আর চারি-জন সুশিক্ষিত, কার্য্যদক্ষ ও বালক-প্রিয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আটটী শ্রেণী বিভাগ করিলেন। নানা স্থান হইতে ছাত্রসমাগম হওয়ায় ক্রমে বিদ্যালয়ের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আবশ্যক হইয়া উঠিল। তখন তিনি, বর্ত্তমান কালে আন্দুল মহিয়াড়ীর ভূষণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস কুণ্ড চৌধুরী মহাশয় যে স্থানে স্কুলবাটী নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন, উহার পার্শ্বস্থ স্থানে একটী সুপ্রশস্ত বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইয়া সেই নূতন বাটীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, "উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়" নামকরণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বিদ্যালয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবে-শিকা পরীক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় হইতে প্রথম বালক প্রেরিত হয়।

পরমেশ্বরের কৃপায়, বালকদিগের সমধিক পরিশ্রমে, শিক্ষকদিগের ও সর্ব্বাপেক্ষা নবীন সম্পাদক মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে বালকেরা সিদ্ধমনোরথ হওয়ায় দেশের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তখন ছাত্রসংখ্যা ১৭৫ জন হইল। এই সময়ে যোগেন্দ্রনাথ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিবর্গের সন্তানের নিকট হইতে কিছু কিছু বেতন গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুইটী মাত্র বালকের অধ্যাপনার উপলক্ষ করিয়া ক্রমে যে এমন সুমহান্ কার্য্যের অবতারণা পূর্ব্বক দেশের অন্ন সংস্থিতির উপায় নিরূপণ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আবাল-বৃদ্ধবনিতার প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, ইহা কেবল পুণ্যশ্লোক যোগেন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের অমোঘ ফল।

প্রথমে ইহাঁকে অনেকেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। এমন কি, ইহাঁর পিতৃদেব, দেশীয় ধনাঢ্যদিগের ব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, স্পষ্টভাবে কিছু না বলিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে

চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার করুণ হৃদয় স্বদেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় অভাব দেখিয়া একবার কাঁদিয়াছে, সে হৃদয় কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবে? বিশ্বনিয়ন্তা অগ্রে থাকিয়া তাঁহার সকল বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিয়া দেন। যোগেন্দ্রনাথ যে সময়ে এই মঙ্গলাকর সুমহান্ কার্য্যের অবতারণায় বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তৎকালে এই সৌভাগ্যবতী আন্দুল পল্লীর আরও দুই একটী সৌভাগ্যবান্ ধনাঢ্য-পুত্র আন্দুলের উন্নতিপক্ষে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন।

পরিচিত বা আত্মীয় ব্যক্তিকে সাময়িক সাহায্য করিলে,সেই উপকৃত ব্যক্তি সাময়িক অভাবের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ হন বটে; কিন্তু যদি ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়গুলি একত্রীভূত হইয়া সর্ব্বজনহিতকর কোন গুরুতর অভাবের মোচন সঙ্কল্পে নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে কত যে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির প্রকৃত অভাব দূর হইত, তাহা নির্ণয় হয় না। অনেক ব্যক্তির হয়ত আমাদের কথা ভাল

লাগিবে না, কিন্তু তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা যাহা বলিলাম, তাহা নিতান্ত মন্দকথা নহে; বরঞ্চ তদনুসারে কার্য্য করিলে দেশের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হইতে পারে।

আজকাল অনেক ধনীসন্তান স্বার্থপরভাবে দান করিয়া ও ভূপতিপ্রদত্ত বহুল উপাধি মালায় অলঙ্কৃত হইয়া আপনাকে দাতা জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হয়েন; পার্শ্বস্থ আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের অনাহার জনিত করুণ বিলাপ উপেক্ষা করিয়া ও চক্ষের উপর স্বদেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় অভাবের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া দূরাগত বৈদেশিক বিলাসীদিগের বিলাস সম্ভোগের কিঞ্চিৎমাত্র অভাব বায়ুভরে কর্ণগত হইলেই অসঙ্কুচিত চিত্তে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করেন; কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ সেরূপ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দানের অপব্যবহার করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করেন নাই, তাঁহার দান যথার্থ পাত্রে ও যথার্থ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সার্থক হইয়াছে। তিনি যদি দুর্ব্বল হৃদয়ে

উপাধি মালায় ভূষিত হইবার প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি আশৈশব কাল যত অর্থ-ব্যয় করিয়া দেশের প্রধান প্রধান অভাব দূর করিয়াছেন, সেই অর্থের বলে তাঁহার নাম বহুল শূন্যগর্ভ বর্ণমালায় বিভূষিত হইতে পারিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বালকগণের সুশিক্ষাই সমাজের উন্নতি সাধনের প্রধান উপায়। এক একটী বালক যে ভবিষ্যৎকালে এক একটী বৃহৎ সংসারের অভিনেতা হইবে, তাহা তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সুশিক্ষা প্রদানের নিমিত্তই সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্কুল সংস্থাপন, তাহার সংরক্ষণ ও সুচারুরূপে পরিচালন করিতে তাঁহাকে অশেষ প্রকার পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তৎসমুদয় সম্পাদন করিয়া দেশের এক অতি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন। ইহারই ফলে আন্দুল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দকে আপনাপন ক্ষমতা-

নুযায়ী অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিতে ও দুই একটীকে স্বদেশের উন্নতি সাধনেও অগ্রসর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলই সেই দেবাত্মা যোগেন্দ্রনাথের অনুকম্পায়। তিনি যদি এরূপ শুভকর কার্য্যের সূত্রপাত না করিতেন, তাহা হইলে আজ আন্দুল আর এক ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। বর্ত্তমানের এ সুখদৃশ্য কল্পনাতেও স্থান পাইত না। তিনি যতদিন এই মরণ-ধর্ম্মশীল মর্ত্ত্যভূমিতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন,ততদিন এক ক্ষণের জন্যও বিদ্যালয়ের মঙ্গল কামনা হইতে বিচ্যুত হন নাই।

তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অপরি-হার্য্য নিয়তির বিরুদ্ধে কাহার শক্তি অভ্যুত্থান করিবে? স্নেহ মমতাও তাহার পাষাণময়ী প্রকৃতিকে কোমল করিতে পারে না।

আন্দুলের ভাগ্যনেমিও সেই নিয়তিচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া অধোভাগে নীত হইল। ১৮৮৪ খৃঃঅব্দে মহিমান্বিত যোগেন্দ্রনাথ লোকান্তর গমন করিয়া আন্দুলকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া

গেলেন। অগত্যা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় যাঁহার প্রাণ, বিদ্যালয়ের উন্নতি অবনতি যাঁহার একমাত্র অনু-ধ্যান, সেই যোগেন্দ্রনাথের গুরুভার আর কাহার দ্বারা সুপরিচালিত হইবে? ক্রমে ক্রমে কার্য্য-প্রণালীর নানাবিধ ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। শিক্ষকেরা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। বিদ্যা-লয়ও ক্রমশঃ শোচনীয় দশায় পতিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে আন্দুলনিবাসী দেশহিতৈষী মহাত্মা শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে আন্দু-লাধিপতি স্বর্গীয় রাজা বিজয়কেশব রায় বাহাদুরের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী রাণী দুর্গাসুন্দরী মহোদয়া আন্দুলের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করি-লেন। তিনি বালকদিগের কাতর বাক্যে ব্যথিত হইয়া "আন্দুল দুর্গাসুন্দরী জুবিলী স্কুল" নাম দিয়া একটী অবৈতনিক উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং সংস্কারাভাবে যোগেন্দ্রনাথের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিনষ্ট হইবার উপক্রম

হইল। এই সময়ে নগেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যধিক ঋণজালে জড়িত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে তাহা রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। মহামনা যোগেন্দ্রনাথের উপযুক্তা পত্নী শ্রীমতী অধরমণি মহোদয়া স্বামীর কীর্ত্তি রক্ষা মানসে দেবরের নিকট হইতে বিদ্যালয়টী বার বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষয়িক সূত্রে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য থাকায় তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া নগেন্দ্র বাবু ১৮৯০ খৃঃঅব্দে মাহিয়াড়ীর কুণ্ডু বাবুদের হস্তে বিদ্যালয়টী সমর্পণ করতঃ মল্লিক বংশের অনন্ত কীর্ত্তির মূলে চিরতরে কুঠারাঘাত করিলেন।

এদিকে মহোদয়া রাণী দুর্গাসুন্দরী অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায় উক্ত রাজষ্টেট্‌টী আন্দুল-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রের করতলগত হয়। এখন হইতে নানা কারণে নব প্রতিষ্ঠিত জুবিলী স্কুলটী দিন দিন অবনতির দশায় পতিত হইতে লাগিল। মাননীয় শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিবার মানসে যথোচিত

যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়া অনেক দরিদ্র ভদ্র সন্তানের উন্নতির উপায় বিনষ্ট হইল। পূর্ব্বোক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীতে অনেক বালক অবৈতনিক অথবা অর্দ্ধবেতনে অধ্যয়ন করিত; এক্ষণে বিদ্যালয় হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পদ্ধতিও আর রহিল না। সুতরাং অনেক অভাবগ্রস্ত দরিদ্র বালককে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

এবম্ভূত বিদ্যালয় বিভ্রাটের অভ্যন্তরে যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা কিরূপ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, তাহা সামান্য মানব-বুদ্ধির অনধিগম্য। কিন্তু ইহাতে যে অধরমণির হৃদয়ক্ষেত্রে দারুণ আঘাত লাগিল, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে আমরা তাঁহাকে এইমাত্র সান্ত্বনা দিতে পারি যে, আন্দুল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের যাহা কিছু উন্নতি বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়, তাহার মূলে তাঁহার পরলোকগত স্বামী যোগেন্দ্র নাথ, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে

না। আন্দুলে এখন যত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে যোগেন্দ্রনাথেরই মহিমা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যোগেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষায় অভিনিবেশ—মকদ্দমার সূচনা—তাঁহার কারাবাস—আন্দুলরাজ বিজয়কেশবের উদারতা—জুরীপ্রথার অবতারণা—দণ্ডাজ্ঞা—পুনর্ব্বিচার—মকদ্দমার পরিণাম—পিতাপুত্রের দর্শন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টীকে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষা এক প্রকার শেষ হইয়া আসিল। তিনি বাল্যকাল হইতে মনে মনে যে অমৃতনিস্যন্দিনী সংস্কৃত ভাষার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন, এক্ষণে সেই মধুময়ী সংস্কৃত ভাষার সেবক হইয়া উঠিলেন। মহিয়াড়ী-নিবাসী সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এতদিনের পর তিনি তাঁহার হৃদয়নিহিত চিরসঞ্চিত আশা সফল হইবার উপক্রম দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

মনুষ্যের ভাগ্যগগনে যে কখন্ কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে সহসা বিষাদমেঘ উদয় হইয়া তাহার হৃদয়স্থিত সুখসূর্য্যকে মলিন করিয়া ফেলে, তাহা কে নির্ণয় করিবে ? যিনি আপনার জীবনকে দেশের উপকারার্থে বিনিয়োজিত করিয়া মানবের আদর্শস্থল হইবেন, কোথা হইতে এক কালস্বরূপ ঘটনাচক্রের বিষম ভ্রূকুটীতে তাঁহার মূল্যবান্ জীবনকে এরূপ বিপজ্জনক করিয়া তুলিল যে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে তাঁহাকে অশেষ প্রকার কষ্ট পাইতে ও বহুল অর্থের অপব্যবহার করিতে হইয়াছিল। একটী অনুগত ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নিজের মহার্ঘ জীবনকে কতদূর বিপদে পাতিত করিয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলে লোক মাত্রেই তাঁহাকে একবাক্যে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

আন্দুলের নিকটস্থ রাজগঞ্জ নামক স্থানের পরপারে বদরতলা নামক গ্রামে একটী ভয়ানক চুরি হাঙ্গামা হয়। "পল্টু" নামক দ্বারবান্ বহুকাল হইতে মল্লিক বাবুদের সংসারে কার্য্য করিয়া

আসিতেছিল। উক্ত গ্রামের চুরি হাঙ্গামা উপলক্ষে দেশের প্রায় অধিকাংশ লোক বলিল, "পল্টু উহাতে লিপ্ত আছে।" বিবেচক জগন্নাথ বাবু তখন কলিকাতায় ছিলেন। তিনি অনেক বিবেচনার পর উক্ত দ্বারবান্‌কে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া বলিলেন যে, "তুমি বাড়ী যাও, তোমার এখানে থাকা হইবে না।" যোগেন্দ্র বাবু এই সময়ে বাড়ীতে বসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। জগন্নাথ বাবু ইহাকে জবাব দিবার নিমিত্ত একখানি পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইলেন। পিতৃভক্তিপরায়ণ পুত্র পত্র পাঠ মাত্র "পল্টুকে" জবাব দিলেন। এই দুষ্ট-প্রকৃতি দ্বারবান্ বহুকাল হইতে এই সংসারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল; বিশেষতঃ যোগেন্দ্রনাথের লালন পালন প্রভৃতি বাল্যোচিত যাবতীয় কার্য্য সমাধা করায় বাড়ীর অনেকেরই অধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং সময় সময় যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যথেষ্ট আবদারও করিত। এক্ষণে হতভাগ্য অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার পদধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল; দয়াল-

হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন বটে ; কিন্তু পিতার আদেশ তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং তিনি তাহাকে "আমি কি করিব বাপু, তোমার নিমিত্ত পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না" এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। হতভাগ্য পণ্টু এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দয়াবান্ যোগেন্দ্রনাথ আর কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত করুণা স্রোত প্রবলবেগে উদ্বেলিত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে ভাসাইয়া দিয়াছিল ; অগত্যা তিনি তাহার কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আজ হইতে আর সরকারী কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না, আমার নিকট হইতে বেতন প্রাপ্ত হইবে ও একজন আশ্রিত, অনুগত ব্যক্তির ন্যায় থাকিবে।" এইরূপে তিনি পিতার আদেশ ও হতভাগ্য ব্যক্তিকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করতঃ "আনন্দ ধাম" নামক বাটীতে তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উক্ত দ্বারবান্ যে চৌর্য্য কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহা তাঁহার আদৌ

বিশ্বাস হয় নাই; বিশেষতঃ তিনি বাল্যকাল হইতে তাহার স্নেহময় ব্যবহারে পরিবর্দ্ধিত হও-য়ায়, তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগই তাঁহার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া চির-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জীবনকে দুরপনেয় কলঙ্কের আধার করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কেবলমাত্র পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের অমোঘ করুণায় সে যাত্রায় পরিত্রাণ পান; তিনি যোগেন্দ্র-নাথের নবনীত সদৃশ কোমল হৃদয়কে অনেক ব্যথায় ব্যথিত করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের নিমিত্ত এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া এক ক্ষণের জন্যও কেহ কখনও তাঁহার প্রস্ফুটিত মুখকমলে কালিমাছায়া সন্দর্শন করে নাই।

যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবস্থা-নুসারে পণ্টুর "আনন্দ ধাম" বাটীতে অবস্থিতি করিবার কিছুদিন পরে পুনরায় "বদর তলায়" চুরি হয়।

দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বারে চতুর্দ্দিকে এরূপ শ্রুত হইতে লাগিল যে, উক্ত দ্বারবান্ চোরদিগের

সঙ্গে ছিল এবং ধরা পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে ধীরপ্রকৃতি যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই জনশ্রুতির সত্যাসত্য নির্ণয়ে মনোযোগী হইতেছেন ; এমন সময়ে ঐ দ্বারবান্‌কে ধরিবার নিমিত্ত কয়েকজন কনষ্টেবল সহিত একজন জমাদার বাটীর দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমাদার দ্বারবান্ পণ্টুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাড়ীর কোন আমলা বলিলেন, "সে স্থানান্তরে গিয়াছে ; বোধ হয়, আজি আসিবে ; আসিলে কাল পাঠাইব।" কিন্তু পরদিন কিছুই হইল না। সুতরাং তৃতীয় দিবসে স্বয়ং দারোগা, কয়েকজন কনষ্টেবল সহ সদলে বাড়ী ঘেরিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, অগত্যা যোগেন্দ্রনাথ মহাবিপদে পড়িলেন ; একদিকে সত্যের অনুরোধ, অন্যদিকে আশ্রিত ব্যক্তির আসন্ন বিপদ। ধর্ম্মপরায়ণ সত্যসন্ধ ব্যক্তির পক্ষে উভয়ই বিষম বিপজ্জনক। অনেক বিবেচনার পর তিনি বুঝিলেন যে দুর্ব্বৃত্তের শাসন হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা ভবিষ্যতে সে জগতের একটী কণ্টকরূপে পরিণত হইয়া গুরুতর অনিষ্ট করিতে পারে।

এইরূপ ভাবিয়া এবং পল্টু যথার্থ দোষী কি না, তাহার যাথার্থ্য নিরূপণে দারোগা অপেক্ষা অধিক-তররূপে সক্ষম হইবেন, এরূপ অনুমান করিয়া তিনি দারোগাকে বলিলেন, "কাল আসিয়াছে কিনা বলিতে পারি না, দেউড়িতে সংবাদ পাঠাই।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে গুপ্তভাবে ডাকাইয়া নানাপ্রকার কৌশল ও চতুরতা সহকারে প্রকৃত বিবরণ অবগত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন যে, সে যথার্থ দোষী, তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় পক্ষে গুরুতর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতে হয়, তখন তিনি ভাবিলেন যে, তাহার শাসন হওয়াই শ্রেয়ঃ। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি কোন লোক দ্বারা পল্টুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন সে একবার বাহিরে আসে। পল্টু তাহাই করিল। দারোগা তাহাকে এই অবসরে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গেল।

আন্দুল বাজারের সন্নিকটে "পদ্মপুকুর" নামে একটী বৃহদাকার পুষ্করিণী আছে। ইহার প্রায় চতুঃপার্শ্ব মল্লিক বাবুদের জমিদারীভুক্ত। এই

স্থানের অধিকাংশ গণিকাগণের আবাস স্থান। তথায় কোন বেশ্যা মল্লিক বাবুদের অন্যতর দ্বারবান্ সুদীন সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। চোরাই মালসমূহ প্রথমে উক্ত বেশ্যার বাটীতে সঞ্চিত হইয়াছিল। পুলিশ কোন চোরের নিকট তাহার সন্ধান পাইয়া বেশ্যার নিকট গমন করিল। বেশ্যার এজাহার লওয়া আবশ্যক হইল। জগন্নাথ বাবু পল্টুকে জবাব দিয়াছিলেন, কেবলমাত্র যোগেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহে সে একপ্রকার "সম্পেণ্ড" স্বরূপে থাকিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক সাহায্য পাইয়া "আনন্দ-ধাম" বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিল। বেশ্যা তাহা সমস্তই জানিত।

বেশ্যা যেরূপভাবে এজাহার দিল, তাহাতে বিচারপতির ধারণা হইল যে, যোগেন্দ্র বাবু চোরদিগের কোনরূপ সহায়তা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ চৌর্য্যের সহায়তা করিবার লোক ছিলেন না, তাহা আন্দুলবাসী কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার সরল হৃদয়ে কখনও এরূপ কুটিল নীতি প্রশ্রয় পায় নাই; কিন্তু ঘটনাচক্রে এরূপ প্রতিপন্ন হইল যে, তিনি পল্টুকে

চোর জানিয়া উহাকে আপনার কাছে রাখিয়া তাহার চৌর্য্যকর্ম্মের সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদেশ পত্র বাহির হইল। মনুষ্যের ভাগ্যচক্র কখন্ কি ভাবে পরিভ্রমণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? কেহ হয়ত আশাতীত ফল লাভ করিয়া পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ বা অভাবনীয় বিপজ্জালে সহসা জড়িত হইয়া, অদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কার দিতেছে। যোগেন্দ্রনাথেরও অদৃষ্টচক্র অনুকূল পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা প্রতিকূলভাব ধারণ করিল। পূর্ব্বে তিনি এরূপ ভয়ানক বিপজ্জালে কখনও জড়িত হন নাই; এই কারণে এই আঘাত তাঁহার পক্ষে কিছু অধিকতর কষ্টকর হইয়াছিল।

বিচারপতি যে দারোগার নিকট যোগেন্দ্র বাবুকে কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞাপত্র দিয়াছিলেন, সেই দারোগা প্রায়ই যোগেন্দ্র বাবুর নিকট মকদ্দমাসূত্রে যাতায়াত করিতেন। যোগেন্দ্র বাবুও তাঁহাকে বিশ্বস্তভাবে অনেক কথাই বলিতেন। অন্যান্য দিবসের ন্যায় এই দিবসও দারোগা সেই

ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে সুবিধামত তাঁহাকে সেই আজ্ঞা-পত্রখানি দেখাইলেন ও বলিলেন,—"এখনি আপ-নাকে থানায় যাইতে হইবে।" তিনি অকস্মাৎ এই মহাবিপদে পতিত হইয়া বলিলেন,—"আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আহারাদি করিয়া যাইব।" তাহাতে দারোগা বলিলেন,—"তথায় আহার করিবেন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমার সহিত চলুন।" এই সময় যোগেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এমন অনেক উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন যে, দারোগা সহসা তাঁহাকে এত সহজে বাটী হইতে লইয়া যাইতে পারিতেন না। এরূপ অপমানজনক আসন্ন বিপদেও যে ইহাঁর ন্যায় সম্ভ্রান্ত জমিদারপুত্র কোন প্রকার ওজর আপত্তি না করিয়া নিতান্ত ধীরভাবে দারোগার সহিত ততক্ষণাৎ হাবড়ার অন্তর্গত "ডোমজুড়ের" থানায় যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির সমীচীনতা ও পরিণামচিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। প্রথমে বাটী হইতে যাইবার সময় তিনি দারোগার পাল্কীতে উঠিয়া

যাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে তাঁহার এরূপভাবে যাওয়া দারোগার চক্ষুশূল হইতে লাগিল। তিনি যোগেন্দ্র বাবুকে পাল্কী হইতে নামাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের কোন কোন কার্য্য দেখিলে বোধ হয় যে, এই সকল লোকের হৃদয় লৌহ বা পাষাণ-নির্ম্মিত। অবশেষে দারোগার নানা কৌশলের মধ্যে পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথকে পাল্কী হইতে অবতরণ করিতে হইল। ইহাতে দারোগার হৃদয়ের দয়া-প্রবণতার পরিচয় দেওয়া হইল, অথবা বৃটিশ রাজ-শক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। যাহা হউক, অগত্যা যোগেন্দ্রনাথ দারোগার সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। এই পথপর্য্যটনের ক্লেশে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া পথিপার্শ্বস্থ এক অশ্বত্থমূলে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তিনি উপবেশন করিলেন।

তৎকালে আন্দুলের চতুঃপার্শ্বস্থ দুই তিন ক্রোশব্যাপী স্থান সমূহে কোন বিদ্যালয় না

থাকায় ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক বালক যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ আগমন করিত। আর পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যোগেন্দ্র বাবু বাটী আসিলেই বিদ্যালয় পরিদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ তিনি বালকদিগকে আন্তরিক যত্নের সহিত ভাল বাসিতেন, এ কারণ বিদ্যালয়ের তাবৎ বালকেই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দরিদ্র বালকদিগের প্রতি অজস্র দান ও অত্যধিক সদ্ভাব প্রযুক্ত অপরসাধারণ বালকবৃন্দও তাঁহাকে অন্তরে পূজা করিত ও তাঁহাকে দেখিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইত। এক্ষণে উক্ত প্রদেশের বালক সমূহ তাহাদের পিতৃস্থানীয় যোগেন্দ্রনাথকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা যোগেন্দ্রনাথকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া বৃক্ষের পল্লব ভাঙ্গিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সরলমতি বালকেরা এমনি ব্যগ্রতার

সহিত বাতাস করিতে লাগিল যে, তাহাতে বোধ হইল, যেন বাতাস দিয়া তাঁহার অন্তরের যাতনাটুকু উড়াইয়া দিতে চাহে। তখন স্নেহপ্রবণ যোগেন্দ্রনাথ বালকদিগের এই অতুলনীয় প্রীতি দেখিয়া তাহাদিগকে শান্ত হইতে বলিলেন।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া দারোগার কঠিন ব্যবহারে নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও বালকদিগের প্রতি সকরুণ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পুনরায় চলিলেন।

ঋজুস্বভাব বালকগণের কোমল হৃদয়ে দারোগার এই পরুষ ব্যবহার বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় আঘাত করিল। তাহারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যোগেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। তিনি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনেক বলিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত না হইয়া থানা অবধি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিল। সেখানে রক্ষিবর্গের কর্কশ বাক্যে ব্যথিত হইয়া প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর অতি কষ্টে ডোমজুড়ের থানায় উপস্থিত হইয়া, যোগেন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎমাত্র জলযোগ

করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে জগন্নাথ বাবু হঠাৎ এবম্ভূত অনিষ্টাপাতে অতিমাত্র কাতর হইয়া তাঁহাকে জামিন দ্বারা মুক্ত করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন জমিদার-কুলতিলক আন্দুলাধিপতি রাজা বিজয়কেশব রায় বাহাদুর সেই রাত্রে স্বয়ং ডোমজুড়ের থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য যথোচিত যত্ন করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রতিভূস্বরূপ রাখিতে স্বীকার করিয়াও সে রাত্রে কোন প্রকারে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। পরদিবস প্রাতে ক্লিষ্ট-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথ প্রহরী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। এখানেও উল্লিখিত সাধু-হৃদয় রাজা বিজয়কেশব জগন্নাথ বাবুর অত্যধিক অনুনয়ে উপস্থিত হইয়া যোগেন্দ্র বাবুর মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাত দিবস হাজতে থাকিবার পর অবশেষে প্রত্যহ উপস্থিত হইতে হইবে, এই নিয়মে প্রচুর অর্থ জামিন স্বরূপ রাখিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি

যখন হাজতে ছিলেন, তখন সেখানকার জঘন্য খাদ্য স্পর্শও করিতেন না; প্রত্যহ কলিকাতাস্থ মেছুয়া বাজারের বাটী হইতে তাঁহার আহারীয় সামগ্রী যাইত। সুতরাং কোমলকায় যোগেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে এই সাতদিন অতিবাহিত করিয়া জামিনে খালাস পাইয়া প্রত্যহ কলিকাতার বাটী হইতে আদালতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বহুল অর্থের অপব্যবহার করিয়া ক্রমাগতই মকদ্দমা চলিতে লাগিল। কলিকাতাস্থ বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রভৃতি সুবিবেচক আইনজ্ঞ উকিল দ্বারা মকদ্দমা সুনিয়মে পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভবিতব্যকে কে কবে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে? অতি যত্ন সহকারে এই মকদ্দমার পরিদর্শন কার্য্য চলিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত দিন দিন মকদ্দমা কঠিনতর হইয়া উঠিল। এই মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হওয়ায় দায়রায় নীত হইল। এই মকদ্দমা উপলক্ষেই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম জুরীপ্রথা প্রচলিত

হয়। আন্দুলের দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে তাঁহার পক্ষে বিচার অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। দায়রার বিচারে তাঁহার সাত বৎসরেরও অধিক ৬ মাস ৪১ দিন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অশনিপাত সদৃশ এই ভীষণ আদেশে পিতামাতা শোকে মুহ্যমান হইয়া একবারে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ পরিপূর্ণ সংসার নিরানন্দের আবাসস্থল হইল। সহসা কোন প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ লতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে তাহা যেমন শ্রীভ্রষ্ট ভাব অবলম্বন করে, মল্লিক বাবুদের সুবিস্তৃত সংসারও সেইরূপ শ্রীভ্রষ্ট ভাব ধারণ করিল। অনতিকাল পূর্ব্বে যে সংসার আনন্দের কেলিনিকেতন ছিল, এক্ষণে তাহা ঘন বিষাদ ও শোকের বিরাম মন্দির হইয়া উঠিল।

আজ আন্দুল যেন যোগেন্দ্রনাথের অভাবে শোভাহীন হইয়াছে। পতিগত-প্রাণা অধরমণি স্বামী বিরহে একান্ত অধীরা হইয়া বৃক্ষ পরিভ্রষ্ট লতার ন্যায় শয্যাশায়িনী হইলেন।

এদিকে যোগেন্দ্র বাবু পুনরায় কারাগারে

নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার কর্তৃপক্ষীয়গণ পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করায় পুনরায় বিচার আরব্ধ হইল। এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সতর্কতার সহিত সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ইহাঁদের পক্ষে মকদ্দমার তত্ত্বাবধায়কগণ বিশেষ সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবিচলিত অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতার গুণে অল্প দিন মধ্যে জগন্নাথ বাবু সফলকাম হইলেন। পরদুঃখকাতর যোগেন্দ্রনাথ একবিংশ দিবস কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

ক্ষণজন্মা সাধু পুরুষগণ বিপদে পতিত হইয়াও আপনাদের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সূর্য্যবংশাবতংশ দাতাগ্রগণ্য হরিশ্চন্দ্র পরোপকারার্থে সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া অবশেষে স্বীয় সুখদুঃখের অংশভাগিনী পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী শৈব্যাকে পরহস্তে বিক্রয় এবং আপনার বহুমূল্য জীবনকে অশ্রদ্ধেয় ঘৃণ্য চণ্ডালকরে সমর্পণ পূর্ব্বক অতি লোমহর্ষণ ভীষণ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই শোচনীয় অবস্থাতেও শ্মশানা-

গত অনাথদিগের উপকার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কু-চিত হন নাই। চন্দ্রকুল-প্রদীপ সত্যসন্ধ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্ম্মতিপরায়ণ দুর্য্যোধনের চাতুর্য্যজালে জড়িত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া যখন একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষোপজীবী হইয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতেছিলেন, সে অবস্থা-তেও ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আপনার মধ্যম ভ্রাতা ভীমকে রাক্ষসের করাল কবলে অর্পণ করিতে বিমনা হন নাই। এইরূপ যতই অনুসন্ধান করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরোপকারী সাধু ব্যক্তিরা যত কেন বিপদে পতিত হউন না, কিছুতেই তাঁহাদের মন হইতে পরদুঃখ-কাতরতা অপগত হয় না। আমাদের যোগেন্দ্রনাথকে এই বিষয়ের একটী দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলে, বোধ করি, অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে না।

তিনি যে সময়ে কারাগারে ছিলেন, তৎকালে আরও আটজন হতভাগ্য ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু সে অবস্থায় তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া আপনার কষ্টের কথঞ্চিৎ অপনয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি,

সেই অবস্থায় তাঁহাদের সহিত এক প্রকার বন্ধুর ন্যায় বিশ্রব্ধ আলাপে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে আপনাপন দুঃখের কথা জানাইয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতেন। একারণ যখন তাঁহার মুক্তির আদেশ প্রকাশ হইল, তখন তিনি তাঁহার কারাগারের বন্ধুদিগকে ফেলিয়া যাইতে অভিলাষী হইলেন না। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন,—"যদি আপনি ইহাঁদিগকে মুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বাটী যাইব, নতুবা এই অবস্থাতেই এখানে থাকিব।" গুণগ্রাহী পিতা সহৃদয় পুত্রের এবম্ভূত বাক্য শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারপতির নিকট উক্ত আট জনের মুক্তির নিমিত্ত আবেদন করিলেন। বিচারপতি তাঁহাদের নিমিত্ত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দণ্ডস্বরূপ চাহিলেন। অগত্যা মহাত্মা জগন্নাথ প্রসাদ উক্ত টাকা দিয়া তাঁহাদিগকেও মুক্ত করতঃ পুত্রকে বাড়ীতে আনিলেন।*

---

* লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে অপরাধীগণকে আবশ্যকমতে ফৌজদারী কারাগার হইতে দেওয়ানী কারাগারে স্থানান্তরিত

পিতা পুত্রের অপূর্ব্ব সম্মিলন, উভয়েরই নেত্র-যুগল হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আন্দুলবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই চিত্তচকোর যোগেন্দ্রনাথের নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রের সুধাপান করিয়া আনন্দে অভিভূত হইল; বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী পরদুঃখকাতর যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঈশ্বর সমীপে স্ব স্ব প্রার্থনা সফল হইয়াছে ভাবিয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

পুত্রস্নেহকাতরা রত্নগর্ভা যোগেন্দ্রজননী এক-ত্রিংশ দিবস একপ্রকার অনাহারে ধরাশায়িনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই হারানিধি কোলে পাইয়া মনের সুখে বারংবার পুত্রমুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। আবার এই আন্দুলের মল্লিক সংসার পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দশ্রীতে শোভমান হইল।

করিতে পারা যাইত। যোগেন্দ্র বাবুও সেইরূপ স্থানান্তরিত হইয়া উক্ত দেওয়ানী জেলে উপস্থিত হইয়া ঐ আট জনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

গোলাপ বাগান—বয়োবৃদ্ধির সহিত অধ্যয়নের আধিক্য—তাঁহার লিখিত পুস্তক—সুরেন্দ্রচরণ মিত্রের ভার গ্রহণ—পিতৃ বিয়োগ—তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যে বিরতি—খগেন্দ্র বাবু ও নগেন্দ্র বাবুর শিক্ষা-বিভ্রাট—বিবাহ—যতীন্দ্রনাথের জন্ম—যতীন্দ্রনাথের শিক্ষার ব্যতিক্রম—বিবাহ—নগেন্দ্রনাথের বৈষয়িক অবনতি—তাঁহার স্ত্রী ত্রৈলোক্য-মোহিনীর মৃত্যু—অধরমণির উপদেশ—যতীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতি অনাস্থার কারণ—তাঁহার মৃত্যু—নগেন্দ্রনাথের শোক—তাঁহার পীড়া—তাঁহার উইল—যশেন্দুবালা ও যোগেন্দ্রনাথের ভগিনীদ্বয়।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমি প্রকৃতির একটী সুরম্য কেলি-নিকেতন। ইনি যেমন এক পক্ষে কহিনুর কৌস্তুভ প্রভৃতি সুদৃশ্য মহামূল্য রত্নের প্রসূতি হইয়া জগতীতলে ঐশ্বর্য্যশালিনীরূপে পরিচিতা হইয়াছেন, অন্য পক্ষে আবার সেইরূপ নেত্র-তৃপ্তিকর বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ হরিদ্বর্ণ শাদ্বলক্ষেত্রের আধার হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপবন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

আবার মনুষ্যেরা ভারতের সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত

উর্ব্বরাশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য খ্যাতি বিশিষ্ট করিয়া তুলে। ফলতঃ আন্দুলের গোলাপ বাগানটীও আন্দুলের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের মধ্যে একটী দেখিবার জিনিস বটে। সেই পরম রমণীয় দৃশ্যটী আন্দুলকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া রাখিয়াছে; এমন কি, যদি কেহ অন্দুল ও প্রান্তবর্ত্তী গ্রামসমূহ দর্শন করিতে আসিয়া আন্দুলের মল্লিক বাবুদের প্রতিষ্ঠিত গোলাপবাগটী দর্শন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কিছুই দেখা হইল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যভাগে সুনির্ম্মল কাকচক্ষু সদৃশ স্বচ্ছবারিরাশিপরিপূর্ণ বৃহদ্‌কায় পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে অতি সুন্দর পত্র-পুষ্পবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজি শোভমান; সম্মুখে বিস্তৃত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্র; সেই বিস্তীর্ণ শাদ্বলক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আম্র, অশোক, দেবদারু, হরীতকী প্রভৃতি বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান। স্থানে স্থানে প্রস্তর ও বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত কৃত্রিম পাহাড় এবং বহুবিধ বর্ণভূষিত মৎস্যাদি পরিপূর্ণ অগভীর কৃত্রিম হ্রদ। তন্মধ্যস্থিত জলজ-

কুসুমের সহিত পূর্ব্বোক্ত মৎস্যসমূহের ক্রীড়া অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে বোধ হয়, যেন কোন এক অনির্দ্দেশ্য আনন্দলোকে বিচরণ করিতেছি। দর্শকবৃন্দের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য স্থানে স্থানে লতাপরিবেষ্টিত মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত আসন সকল অতি সুকৌশলে সংস্থাপিত রহিয়াছে। কোথাও বা সাধকমণ্ডলীর সাধনের নিমিত্ত বৃক্ষতলে ও সুদৃশ্য তৃণকুটীরে স্তবকে স্তবকে প্রস্তর নির্ম্মিত আসন শোভা পাইতেছে। পুষ্করিণীর উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাভিমুখ দ্বিতল হর্ম্ম্য ও দক্ষিণ দিকে একটী সুদীর্ঘ পরিখা। উদ্যান মধ্যস্থ পুষ্পবাটীকার পশ্চিম পার্শ্বে নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত শিবমন্দির। ইহার চারিদিকে ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর। অধিক কি, উদ্যানটীর শোভা সমৃদ্ধি এত বিচক্ষণতার সহিত সংসিদ্ধ হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন। যখন সহস্রকর সূর্য্য অল্পে অল্পে আপনার বিস্তীর্ণ করজাল সঙ্কুচিত করিয়া পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইতে থাকেন, তখন উদ্যান মধ্যস্থ পুষ্করিণীর সোপান

শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে, অন্তঃকরণ মধ্যে এক অভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতে থাকে।

এক্ষণে আমরা যে স্থানকে "গোলাপবাগান" নামে অভিহিত করিয়া এতদূর প্রশংসা করিতেছি এবং যাহাকে মৃত মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক ও নগেন্দ্রনাথ মল্লিক ভ্রাতৃদ্বয় অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া আন্দুলের একটী সর্ব্বপ্রধান দৃশ্য-পদার্থরূপে রাখিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাবধিও তাঁহাদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিগণ যাহার পূর্ব্ব-শোভা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অপরিমিত যত্ন প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না, তাহা পূর্ব্বে একটী কলাবাগান ছিল। উক্ত কলাবাগান আন্দুল রায়পাড়া-নিবাসী বাবু রামচাঁদ মহাশয়ের ছিল। ইহা যেরূপে মল্লিক বাবুদের হস্তগত হয়, তাহার অভ্যন্তরে একটী রহস্যজনক ব্যাপার আছে। পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এক দিবস রামচাঁদ রায় মহাশয়ের পত্নী কার্য্যোপলক্ষে মল্লিক বাবুদের বাটীতে নিমন্ত্রণ

রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মল্লিক বাবুদের বধূর নাসিকায় উৎকৃষ্ট মতিসংযুক্ত নত দেখিয়া অত্যন্ত লোভাকৃষ্ট হন। তখন মতির মূল্যও অধিক, বিশেষতঃ তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থাও তত ভাল নয়, একারণ তাঁহার স্বামীকে কোন কথা না বলিয়া হৃদয়েই তাহা চাপিয়া রাখিলেন। যদিও তখন তাঁহার বাসনা সফল হইল না বটে, তথাপি একদিনের তরেও সে লালসা মন হইতে অন্তরিত করিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার সসত্ত্বাবস্থায় স্বামীর নিকট হইতে সেই পূর্ব্ব-বাসনা পরিপূরণার্থে মতি-সংযুক্ত একটী নত প্রার্থনা করিলেন। রামচাঁদ রায় মহাশয়ের অবস্থা তখন এমন নয়, যে, উক্ত মূল্যবান্ দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া পত্নীর মনোরঞ্জন করেন। অথচ স্ত্রীর গর্ভদোহদ পূর্ণ করা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ স্ত্রীর বারম্বার উপরোধে তাঁহার মনোমধ্যে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল; এবম্ভূত কারণে আপন দীন অবস্থার প্রতি যথোচিত ধিক্কার দিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, উক্ত কলাবাগানটী মল্লিক বাবুদের নিকট বন্ধক রাখিয়া টাকা গ্রহণ করিবেন।

ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ইচ্ছানুরূপ মতি ক্রয় করতঃ তিনি পত্নীর সাধ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত টাকা পরিশোধের কোন প্রকার উপায় করিতে না পারায়, ক্রমে ক্রমে কলাবাগানটী মল্লিক বাবুদের হস্তগত হইল। পূর্ব্ব হইতেই উক্ত কলাবাগানটীর প্রতি গোকুলনাথ মল্লিক মহাশয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনিই উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। গোকুলনাথ বাবু যতদিন আন্দুলে ছিলেন, ততদিন ইহাকে কলাবাগান করিয়াই রাখিয়াছিলেন। কেবল মাত্র উহাতে একটী পুষ্করিণী খনন করেন। এই পুষ্করিণীটীই বর্ত্তমান কালে "গোলাপ-পুকুর" বলিয়া খ্যাত। কিছুদিন পরে উক্ত গোকুলনাথ বাবু আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুরের পিতার সহিত কোন সূত্রে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। সেই বিবাদ লইয়া আদালতে এত অধিক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল যে, তাঁহাকে তজ্জন্য যারপর নাই উৎকণ্ঠিত ও বহুল ঋণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল। অগত্যা তিনি উক্ত "কলাবাগান" জগন্নাথপ্রসাদ বাবুকে বিক্রয় করিয়া হাবড়ার

নিকটস্থ রামকৃষ্ণপুরে বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ বাবু ঐ বাগানে একখানি "আটচালা" নির্ম্মাণ করিলেন; উক্ত স্থানে কিছুদিন স্কুলও বসিয়াছিল। পরে ১২৭১ সালে আশ্বিন মাসের সুপ্রসিদ্ধ ঝড়ে যখন উক্ত আটচালাখানি পড়িয়া যায়, তখন মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় আটচালার স্থানে বর্ত্তমান "বৈঠকখানা বাটী" বা "শান্তি মন্দির" নির্ম্মাণ করাইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে যোগেন্দ্র বাবুই "গোলাপ বাগানের" পত্তন ও সংরক্ষণ করেন। মধ্যে যখন যোগেন্দ্র বাবু পিতৃবিয়োগের পর কোন বিশেষ কারণে বৈষয়িক কার্য্য পরিদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকেন, তখন নগেন্দ্র বাবু বৈষয়িক কার্য্যের সহিত বাগানের কার্য্যেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনিই বাগানটীকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলেন। আজ তাঁহারা কোথায়? আন্দুলের ভবিষ্য-বংশীয়েরা হয়ত আর কিছুদিন পরে তাঁহাদের নামও জানিতে পারিত না। এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে কত লোক আসে, কত লোক যায়,

কে তার সন্ধান লয় ? কিন্তু যিনি আসিয়া কিঞ্চিৎ পদচিহ্ন রাখিয়া যান, তাঁহারই নাম জগতে চিরকাল ঘোষিত হইতে থাকে। কত সুদীর্ঘকাল চলিয়া গেল, কিন্তু আজও রাজা রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আপামর সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন। আন্দুলস্থ গোলাপ বাগানটীও যোগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের স্মৃতি আন্দুলবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে রক্ষা করিবে।

প্রজ্ঞাবান্ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতীর্থেরও উপযুক্ত যাত্রী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিদ্যার্থীকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যোগপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় সকল সুখকামনা হইতে বিমুখ হইতে হয়। নিয়তই একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় আপনার অভীষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করিলে তবে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা। "ট্রেনিং স্কুলে" ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা যে কি বস্তু, তাহা যোগেন্দ্রনাথ বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছিলেন। একবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তখন বি-এ, এম্-এ, প্রভৃতি

পরীক্ষা সকল প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখন ভাষায় এক প্রকার ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারিলেই শিক্ষা শেষ হইত। তৎকালে এই "ট্রেনিং স্কুল" কলিকাতার মধ্যে এক প্রধান বিদ্যালয় ছিল। ইহাতে ইংরাজি শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে দুইটী হিন্দু বালকের মধ্যে একটী আমাদের যোগেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়টী কলিকাতা নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুর। ঈশ্বরের কৃপায় যোগেন্দ্রনাথ ইংরাজি শিক্ষা একপ্রকার শেষ করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু তিনি বাড়ী আসিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। ক্রমে দেবভাষা সংস্কৃতের আন্তরিক সেবক হইয়া উঠিলেন। তিনি এরূপ বয়োধিক অবস্থাতেও প্রত্যূষে মুখ প্রক্ষালনান্তর অধ্যয়নে বসিতেন ও বেলা নয় ঘটিকাবধি পাঠ অভ্যাস করিয়া স্নানাহার প্রভৃতি অবশ্য-করণীয় কার্য্য সকল সমাধা করিতেন; পরে কথঞ্চিৎ বিশ্রামের পর স্কুল পরিদর্শন করিয়া পুনরায় অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন। অপরাহ্নে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ

পরিবৃত হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রালাপ, সংস্কৃত শ্লোক রচনা, পদ পূরণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকা অবধি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার আর একটী এই গুণ ছিল যে, তিনি কোন নূতন বিষয় বা সুন্দর রচনাপ্রণালী বা বিশুদ্ধ ভাবসমন্বিত কোন শ্লোক শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহা লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আমরা তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে উপকরণ পাইবার আশায়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত অনন্তরামপুর নিবাসী সুরেন্দ্রচরণ মিত্র নামক একব্যক্তি তাঁহার স্বহস্তলিখিত শ্লোক-সংগ্রহ নামক একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আমাদিগকে দিলেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। এই পুস্তক অতি সুন্দর, বিশুদ্ধ ভাবসম্বলিত এবং বহুসংখ্যক শ্লোক ও নানাবিধ পদ রচনায় পরিপূর্ণ। পুস্তক খানির যত পত্রোৎঘাটন করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রকাশ পাই-য়াছিল। এই পুস্তকের স্থানে স্থানে সুবিখ্যাত

সাধকদিগের নীতি কথা সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতেছে। বস্তুতঃ পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত অবলোকন করিলে, তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সুরেন্দ্র বাবু অনন্তরামপুর নিবাসী মিত্রবংশ-সম্ভূত; মল্লিক বাবুদের সহিত ইহাঁদের আত্মীয়তা আছে, বিশেষতঃ বংশপরম্পরায় ইহাঁরা মল্লিক বাবুদের কর্ম্মচারী। সুরেন্দ্র বাবু বাল্যকাল হইতে আন্দুলে আসিয়া ইহাঁদের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক যোগেন্দ্র বাবুর স্কুলে অধ্যয়ন করেন, যোগেন্দ্র বাবু সুরেন্দ্রচরণের ধর্ম্মপ্রবণতা ও সত্যবাদিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

তিনি কি বালক, কি বৃদ্ধ, যে কোন ব্যক্তি হউন, যাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র গুণ পরিলক্ষিত হইত, তাঁহাকেই অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন ও তাঁহার উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিতেন না। এইকারণ সুরেন্দ্র বাবুর বাল্যজীবনে ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হওয়ায় যোগেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। ইনি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার সুন্দররূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ

অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায়, তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, অগত্যা যোগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিখাইতে লাগিলেন এবং আপনাদের বৃহৎ সংসারের বিশ্বাসী কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। শ্লোকসংগ্রহ পুস্তকের অধিকাংশই সুরেন্দ্র বাবুর লিখিত ; যোগেন্দ্র বাবু যখন নিজে লিখিতেন না, তখন সুরেন্দ্র বাবুকে বলিয়া যাইতেন, তিনি লিখিয়া রাখিতেন।

এইরূপে যোগেন্দ্রনাথ নূতন নূতন শ্লোক রচনা ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় অধিককাল যাপন করিতেন। এমন সময়ে দারুণ শোকজনক পিতৃবিয়োগে তাঁহার সকল শান্তি অপহৃত হইল। লীলাময় কালের মহারহস্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এমন লোক জগতীতলে অতি বিরল। কিন্তু আমরা এইটুকু জানি যে, সেই সর্ব্বসংহারক কালেরও অভ্যন্তরে মঙ্গলময় মহান্ পরমেশ্বরের ঐশীশক্তি বিরাজ করিতেছে। সকল সময়ে আমরা ইহা ধারণা করিতে পারি না, এ কারণ আমরা শোকে দুঃখে পতিত হইলেই অদৃষ্টকে বারম্বার নিন্দা করিতে থাকি।

দেখিতে দেখিতে আমাদের যোগেন্দ্রনাথ পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে মহাত্মা জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক হঠাৎ পরলোক গমন করিলেন। যোগেন্দ্র বাবু পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন। তাঁহার হৃদয়কন্দর পিতৃভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি পিতার আদেশ পালন বা তাঁহার শুশ্রূষায় সময়াতিপাত করিতে পারিলে অতিশয় সুখানুভব করিতেন; পিতার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। এমন কি, তিনি পিতাকে নিয়ত প্রফুল্ল বা সুস্থশরীর দেখিলে, আপনাকে দেবতাদিগের ন্যায় পরম সুখী বোধ করিতেন। এ হেন পরম পূজনীয় পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে, তাঁহার হৃদয় নিদারুণ শোকশল্যে বিদ্ধ হইল। তিনি একবারে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। ধীর যোগেন্দ্রনাথ যদিও অত্যন্ত সহিষ্ণু, অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিবেকবান্ ব্যক্তির ন্যায় পরিণামচিন্তাশীল ছিলেন, তথাপি যেন উত্তালতরঙ্গমালাপরিবৃত জলধি-মগ্ন ব্যক্তির

ন্যায় পিতৃবিয়োগে এই সংসারসাগরমাঝে তিনি নিতান্ত সহায়শূন্য ও অবলম্ববিহীন হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি যেরূপ পিতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে যে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ বিষাক্ত বিশিখের ন্যায় নিরন্তর তাঁহাকে প্রপীড়িত করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কর্ত্তব্যপরায়ণ যোগেন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগে একান্ত মুহ্যমান হইলেও কর্ত্তব্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি দুঃসহ শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া আপনাদিগের বংশগত প্রথায় পিতৃদেবের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য যথাবিধানে সমাধা করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য অবশ্য করণীয়। সাধারণতঃ জমিদারদিগের যেরূপ আড়ম্বরের সহিত এই সকল ব্যাপার সমাধা হইয়া থাকে, তিনি তদ্বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই। উপযুক্ত বিবেচক ব্যক্তিদিগের উপর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সভাস্থলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। সদাত্মা ব্রাহ্মণমণ্ডলী বহুসংখ্যক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সকলেই স্ব স্ব পরিজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ, শ্রাদ্ধসম্পর্কীয় দান, দ্রব্যের প্রচুরতা, অভ্যর্থনার শৃঙ্খলা, পরিচর্য্যার প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দূরাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের যথাযুক্তরূপে বিদায় করা হইয়াছিল। অতিথি কাঙ্গালীদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ যাহার যে বিষয়ে প্রার্থনা ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে প্রভূত সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। পুরবাসীবৃন্দের আগ্রহে, কর্ম্মচারী সমূহের অত্যধিক আয়াসে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সমধিক যত্নে, সহোদর যুগলের যথাবিধি পরিদর্শনে, শ্যামাসুন্দরীর ঐকান্তিক স্বামীভক্তিতে ও সর্ব্বোপরি যোগেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম পিতৃপরায়ণতায় ঈদৃশ মহদ্ব্যাপারের বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই।

শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনের পর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শাস্ত্রচর্চ্চা, বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি বহুদিন নীরস বৈষয়িক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণী কোন একটী সামান্য ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার বিপরীতে অনুচিত মত সমর্থন করেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। এই সূত্রে তিনি বৈষয়িক কার্য্য হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিলেন। ঘটনাটী নিম্নে উল্লিখিত হইল। এই কারণ বশতঃ সাংসারিক কার্য্যে যোগেন্দ্রনাথের অমনোযোগিতাই মল্লিক বংশের অতুল বিষয়ের ধ্বংসের এক প্রধান কারণ। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পিতৃ-বিয়োগের পর মহাত্মা যোগেন্দ্রনাথ বিষয়াদি কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর পরে এক সময়ে ইহাঁদের স্থানীয় জমিদারীর মধ্যে বহু পুরাতন একটী আম্র বাগানের বৃক্ষগুলি কোন কার্য্যোপলক্ষে কাটিবার প্রয়োজন হয়। তাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন চারি শত টাকা হইবে।

যোগেন্দ্র বাবু মহিয়াড়ী নিবাসী জনৈক কর্ম্মচারীকে কোনও জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত বাগানের কাষ্ঠগুলি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। উক্ত কর্ম্মচারী লোক লাগাইয়া বৃক্ষগুলি কাটাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এই বাটীরই অপর এক কর্ম্মচারী বাড়ীর ভিতর গিয়া যোগেন্দ্রনাথের মাতা শ্যামাসুন্দরীকে বলিলেন যে, "আম্র বাগানটীতে যথেষ্ট কাঠ আছে, সরকার হইতে কাষ্ঠগুলি বিক্রয় হইলে প্রায় পাঁচ সাত শত টাকা হইবার সম্ভাবনা; একজন কর্ম্মচারীকে গাছগুলি এরূপ ভাবে দেওয়া ভাল হয় নাই।" শ্যামাসুন্দরী এই কথাগুলি শুনিয়া একটু উগ্রভাবে একজন দ্বারবান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, "গাছগুলির অর্দ্ধেক তাঁহাকে লইতে বল, নতুবা গাছ কাটিবার আবশ্যক নাই।" উক্ত কর্ম্মচারী এই কথা শুনিবামাত্র যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে গেলেন।

যোগেন্দ্র বাবু উক্ত বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু

কি করিবেন—মাতৃ-আজ্ঞার উপর কথা কহা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে; অগত্যা তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হইল ও অপমান তাঁহার অন্তঃকরণকে নিয়ত দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ধীর ও শান্তস্বভাব ছিলেন। উদ্ধত ব্যবহার কখন তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পায় নাই। নিজেই স্থির করিলেন যে, এরূপ অবস্থায় বিষয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোন মতেই উচিত নয়। তিনি সেইদিন হইতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "যতদিন বাঁচিব কখন বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিব না।" কার্য্যেও তাহাই করিলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও মধ্যম ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এরূপ অনাসক্তভাবে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "বিষয় কোথায় যে তাহা দেখিব, যা যৎকিঞ্চিৎ আছে তা তোমরা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।" এই অবধি তিনি ভ্রম ক্রমেও কখন কাছারিতে যান নাই। মহাত্মা ব্যক্তি একবার কোন প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা সহজে ভঙ্গ করেন না। যোগেন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। কি

বিষয়ের মায়া, কি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ, এমন কি সর্ব্বোপরি মাতাঠাকুরাণীর বারম্বার উপরোধ, কিছুতেই আর তাঁহার চিত্ত বিষয়েতে আকৃষ্ট হইল না। তিনি প্রথমাবধি যেরূপ রীতিতে কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, যদি বরাবর সেইরূপ ভাবে করিতেন, তাহা হইলে কখন এত শীঘ্র তাঁহাদের বিষয়ের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিত না। তিনি যথাবিধি দান, অতিথি সেবা, ঠাকুর সেবা, ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন, বিদ্যালয় সংরক্ষণ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াও পিতার যাহা ঋণ ছিল, তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর যখন বৈষয়িক ব্যাপারের ভার ন্যস্ত ছিল, তখন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছাড়া দুই একটী কার্য্য সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, খগেন্দ্রনাথ নামক তাঁহার একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। যখন যোগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ, তখন খগেন্দ্র বাবু জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি পিতা মাতার সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অত্যন্ত আদরের ছিলেন।

বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষাতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি স্বয়ং সমাগত নিঃসহায় দরিদ্র রোগী-দিগকে মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করিয়া পথ্য ও পাথেয় দিয়া উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি দয়ালু ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। নিজের বেশভূষার প্রতি তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সংস্রব রাখিতেন না। তিনি কলিকাতাস্থ সিমলা নিবাসী সিংহ বাবুদের পরিবারে বিবাহ করেন। সঙ্গদোষে ক্রমশঃই তাঁহার মদ্যাসক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দিবস তিনি তাঁহাদের কলিকাতাস্থ মেছুয়াবাজারের বাটীতে অত্যধিক মদ্যপান করিয়া সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হন, সেই অবস্থাতে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। সংসারে কেবলমাত্র দুইটী কন্যা রাখিয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সিংহের সাহায্যে শ্রীমতী অধরমণি ও নগেন্দ্র বাবুর সহিত মোকদ্দমা করিয়া বিষয়াদি পৃথক্ করিয়া লন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা নগরীতে সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু শ্বশুরবংশের

কীর্ত্তি-কলাপ রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, এবিষয়ে তিনি বিন্দু-মাত্র মনোনিবেশ করেন নাই।

আমরা যোগেন্দ্র বাবুর কার্য্যের উল্লেখ করিতে গিয়া, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে অতি আড়ম্বরের সহিত খগেন্দ্র বাবুর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়; ইহার পর হইতেই তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ও মধ্যম ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বাবু সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ইহাঁদিগকে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া লোকান্তর গমন করেন। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার শ্রাদ্ধাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণ, অতিথি অভ্যাগত বিদায় ও ব্রাহ্মণ কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর কিঞ্চিৎ ঋণ ছিল; যোগেন্দ্র বাবু তাহা নিজে পরিশোধ করিয়া মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ইহার পর হইতে তিনি এক

প্রকার সংসারের সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া নামে মাত্র সংসারী হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপ্রেমের অনেকটা আভাস দিয়াছি। এক্ষণে তিনি সমস্ত বৈষয়িক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিয়া সৌভ্রাত্রভাবের কিছুমাত্র অপচয় করিলেন না। ইহাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি যদি অন্য দিকে প্রসারিত না হইয়া বিদ্যা শিক্ষার অভিমুখে প্রধাবিত হইত, তাহা হইলে তিনি একজন মল্লিক বংশের অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ হইয়া আন্দুলকে আলোকময় করিতে পারিতেন। কিন্তু নানা কারণে যোগেন্দ্রনাথের বিষয়ে বিরাগ ও নগেন্দ্র বাবুর শিক্ষা-বিভ্রাট্ সংঘটিত হইয়া মল্লিক বংশের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিল।

যখন নগেন্দ্রনাথের বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখন তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সময়ে ইনি ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নমিত হইয়াছিলেন। বিবাহের ৫।৭ মাস পরেই একবারে স্কুল পরিত্যাগ করেন।

যখন ইহাঁর বয়স পঞ্চবিংশ ও ইহাঁর পত্নী ত্রৈলোক্যমোহিনীর বয়স পঞ্চদশ বর্ষ, তখন অর্থাৎ ১২৬৯ সালে ১৮ই মাঘ মঙ্গলবার তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ আন্দুলের বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন। যে দিবস তিনি সূতিকাগার হইতে বাহির হইলেন, তৎপর দিবস হইতে স্নেহময়ী অধরমণির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত নগেন্দ্রনাথের আরও দুইটী কন্যা হয়। তন্মধ্যে প্রথমার নাম রাজবালা ও দ্বিতীয়ার নাম গিরিবালা।

মহোদয়া অধরমণির আন্তরিক যত্নে যতীন্দ্রনাথ দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তিনি যেমন দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও তদ্রূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাল্যকাল হইতেই অত্যধিক আদরে তাঁহার চিত্ত এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, তিনি আর কাহাকেও ভয় করিতেন না; এমন কি, বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষককেও ভয় করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়ায় অতিশয় অবহেলা ছিল। যতক্ষণ সেই শিক্ষকটী বসিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ

তিনি পড়িতেন, তদ্ভিন্ন আর কাহারও কাছে পড়িতেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত শিক্ষকটী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলেন, তৎসঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারও লেখা পড়ার অবসান হইল; নামমাত্র আরও কয়েক মাস স্কুলে পড়িয়াছিলেন। এই অল্পদিন মধ্যে তিনি কুসঙ্গ-দোষে মদ্যপ্রিয় হইয়া উঠিলেন্। মাতৃস্থানীয়া অধরমণি অপুত্রক হইয়াও ইহাঁকে পাইয়া যেন পুত্রবতী হইয়াছিলেন। তিনি, যোগেন্দ্র বাবু ও নগেন্দ্র বাবু ইহাঁরা সকলেই তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুষ্পরিহর পানদোষের হস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্গীতের নানাবিধ যন্ত্র প্রভৃতি আনন্দ-দায়ক বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া দিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই দুর্দ্দমনীয় পানেচ্ছা শমিত হইল না। এই সময়ে ইহাঁর বিবাহের কথা আসিতে লাগিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। হেম বাবু আন্দুলে আসিয়া পাত্রের লেখা

পড়ার বিষয় ততদূর লক্ষ্য করিলেন না। তিনি দেব-প্রকৃতি যোগেন্দ্রনাথের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, এই আহ্লাদে বিশেষতঃ বিস্তর বিষয়াদি দেখিয়া ভবিষ্যতে কন্যার কোনরূপ কষ্ট হইবে না, এইরূপ ভাবিয়া বিবাহের এক প্রকার স্থির করিয়া গেলেন। প্রচুর সমারোহের সহিত বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। আন্দুল মহিয়াড়ীর অধিকাংশ ভদ্রলোক বিবাহোৎসবে যোগ দিয়া চন্দ্রপুরে গিয়াছিলেন। হেম বাবুও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

হেম বাবু যত্ন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এখানেও পাকস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য অতি সমারোহের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের কিছুকাল পরে যতীন্দ্রনাথের পানদোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার আহারের প্রতি আদৌ লক্ষ্য ছিল না। একে শীর্ণকায় দুর্ব্বল, তাহার উপর প্রত্যহ মাদক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করায় অতি অল্প দিন মধ্যে তাঁহার শরীর আরও ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। কেবলমাত্র মাতা ঠাকুরাণীর পীড়া-

পিড়িতে কিঞ্চিৎ খাদ্য গলাধঃকরণ করিতেন। এ দিকে নগেন্দ্র বাবু পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিষয়াদি ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী পতি পুত্রের এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া যার পর নাই চিন্তিতা হইলেন। এই চিন্তাই তাঁহার পক্ষে কালচিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি ত্বরায় রোগে আক্রান্ত হইলেন। বহুবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কিছুতেই আর সেই কালস্বরূপ ব্যাধির উপশম হইল না। অবশেষে দুঃখময় জগতের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্ব্বক পতি পুত্রকে রাখিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। মাতার পরলোক গমনের সহিত যতীন্দ্র বাবুর সুরা সেবন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে মাতা ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহে কিছু কিছু আহার করিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ যত্নের সহিত খাওয়াইবার লোক কেহ ছিল না। সুতরাং দিন দিন শরীর আরও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পিতা সন্তানকে সুপথে আনিবার নিমিত্ত

যত্নের ত্রুটি করেন নাই; ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত লোক আনাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিলেন না। ইহার উপর আবার পুত্রের সন্তানাদি হইল না দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু আরও বিষণ্ণ হইলেন এবং বৈষয়িককার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অমনোযোগী হইয়া অধরমণির সহিত মোকদ্দমা করিয়া বৃথা গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল কারণে নগেন্দ্র বাবু আরও অধিক পরিমাণে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের একটী কন্যা হয়।

প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণস্বরূপ পত্নীর প্রেমপূর্ণ মুখকান্তি ও কন্যার অর্দ্ধবিকসিত হাসি-মুখখানি দেখিয়াও যতীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন্দিরে একটুমাত্র প্রাণের আশা স্থান পাইল না। তাঁহার অন্তরে জীবনের প্রতি যে কি এক ভয়ানক অনাস্থা আসন লাভ করিয়াছিল, তাহা তিনিই জানিতেন। ক্রমে যখন তিনি একপ্রকার আহারাদি বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র মদ্যকেই তাঁহার একমাত্র আহারস্থানীয় করিলেন, তখন মহোদয়া অধরমণি অত্যধিক বিবাদ থাকাতেও আর হৃদয়কে চাপিয়া

রাখিতে পারিলেন না। তিনি আশৈশবকাল তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহার কত আবদার সহ্য করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহাকে এক-ক্ষণের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে কষ্ট বোধ করিয়াছেন; আজ সেই যতীন্দ্র ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর ভীষণ কবলে প্রাণ দিতেছে, ইহা শুনিয়া স্নেহময়ী অধরমণি কি কখনও স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া, একদিন অত্যন্ত অগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু তুমি কি মনে ভাবিয়াছ? জীবন ত্যাগ করাই কি তোমার স্থিরসঙ্কল্প?" এই কথা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "মা! কি করব, আমি কি এর পর গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে যাব?" এতদ্ব্যতীত আর কোন কথা বলিলেন না। তখন পরিণামচিন্তাশীলা অধরমণি বুঝিতে পারিলেন যে, মৃত্যুই ইহাঁর স্থিরসঙ্কল্প। অগত্যা তিনি অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে মল্লিক বংশের গাঢ় তমসাবৃত ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সুরারাক্ষসীর দুষ্পরিহর

পরিণাম প্রকাশ পাইল—পীড়ার সূত্রপাত দেখা গেল। চিকিৎসক বলিলেন, "লিবর" হইয়াছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে একটু একটু জ্বরও হইতে লাগিল। তথাপি একদিনের জন্যও মদ্য বন্ধ হইল না। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; শয্যাগত হইলেন; তখন মদ্য বন্ধ হইয়া চিকিৎসা হইতে লাগিল। পত্নী মৃণালিনী স্বামীর এবম্ভূত পীড়া-কালীন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পতিসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই আন্তরিক যত্নে যতীন্দ্র নাথ প্রথমবার আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ আর একদিন যতীন্দ্র বাবু কুসঙ্গীর পরামর্শে পুনরায় মদ্যপান করিলেন। তৎপর দিবস হইতেই পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১২৯৭ সালের মাঘ মাসে তিনি ইহলোক হইতে চিরতরে অপসৃত হইলেন।

তখন নগেন্দ্র বাবু শোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে বালবিধবা পুত্রবধূ এবং পিতৃহীন বালিকা তাঁহার শোককে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। শোকপ্রভাবে যেন তিনি

কেমন এক প্রকার হইয়া গেলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে বাতরোগে কাতর করিয়াছিল; এখন সেই বাতরোগ শোকের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিল। এবার তিনি উত্থান-শক্তি রহিত হইলেন। এমন কি, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও রহিল না। পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া কলিকাতা হইতে ইংরাজ ও ভাল ভাল বাঙ্গালি চিকিৎসক আনীত হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পীড়ার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন কি, এরূপ অবস্থায় পতিত হইলেন যে, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। মনস্বিনী অধরমণি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গেলেন; এক্ষণে যাহাতে শ্বশুর কুলের মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ পুত্রবধূর মঙ্গল কামনা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তিনি এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ বধূমাতাকে সঙ্গে করিয়া গোলাপবাগানের বাটীতে যাইতে লাগিলেন এবং বিষয়াদির সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত কলিকাতাস্থ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন

ঠাকুরের সুযোগ্য বিষয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বর্ম্মণ ও কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও অন্যান্য দেশীয় সদ্বিবেচক ব্যক্তিদিগকে আনাইয়া একখানি উইল করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মৃত্যুর ১০।১৫ দিন পূর্ব্বে উল্লিখিত সদ্বিবেচক ব্যক্তিগণ প্রথমে উইলের একখানি প্রতিলিপি করাইলেন। তখন নগেন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, সুতরাং তাঁহারা তাহা উহাঁকে শুনাইয়া তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ করিলেন; কেবল মাত্র স্বাক্ষরকার্য্য বাকি ছিল। সেই উইল-খানির মর্ম্ম এই যে, তাঁহার সম্পত্তি তিন সম অংশে বিভক্ত হইবে। ১ম অংশ বিধবা পুত্রবধূ মৃণালিনীর,২য় অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজবালার ও ৩য় অংশ কনিষ্ঠ কন্যা গিরিবালার। কিন্তু আত্মীয়স্বজনকৃত নানা গোলযোগের মধ্যে মধু বাবু স্বাক্ষর করাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সময় নগেন্দ্রনাথের জীবনদীপও অনন্তদীপের সহিত মিশাইয়া

গেল। সুতরাং নগেন্দ্র বাবুর অবর্ত্তমানে, তাঁহার কন্যাদ্বয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। এক বৎসর মধ্যে রাজবালা বাতরোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। দুই দিন পূর্ব্বে যিনি সকল বিষয়ের অধীশ্বরী ছিলেন, দুর্দ্দমনীয় কাল আজ তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষিণী করিয়া তুলিল।

এখন কেবলমাত্র নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা গিরিবালা ও যতীন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা যশেন্দু-বালা বর্ত্তমান থাকিয়া নগেন্দ্রনাথের বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন।

যোগেন্দ্রনাথের দুইটী ভগ্নী ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমার নাম কৈলাসকামিনী ও দ্বিতীয়ার নাম কৃষ্ণভাবিনী। কলিকাতার অন্তর্গত জানবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন দত্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ বেচারাম দত্তের সহিত কৈলাসকামিনীর বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি অল্পকাল হইতে দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫০ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী কলিকাতা হাটখোলাস্থ ৺কাশীনাথ দত্তের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন

দত্তের সহিত পরিণীতা হন। হাটখোলার দত্তবংশ প্রসিদ্ধ বংশ; অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বংশের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহার বহুল শাখা প্রশাখা ইতস্ততঃ সম্প্রসারিত হইয়া অনেক দুঃখ-তাপ-তাপিত দরিদ্র ব্যক্তির আশ্রয়স্থান হইয়াছে। কৃষ্ণধন বাবু কলিকাতার প্রধান আদালতের উকিল ছিলেন। সাধারণতঃ উকিলেরা যেরূপ প্রকৃতির লোক হন, ইনি সেরূপ ছিলেন না। ইহাঁর হৃদয় দয়া-ধর্ম্মে বিভূষিত ছিল। আজীবনকাল তাঁহার জীবনকে পরোপকারার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমের নাম কমলকুমার দত্ত ও দ্বিতীয়ের নাম সুরথনাথ দত্ত। সুরথনাথ অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। কেবলমাত্র কমলকুমার বাবু শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর পতিপুত্রশোকের প্রজ্জ্বলিত শিখাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিতেছেন।

প্রবল ঝটিকা প্রভাবে মহারণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে যেরূপ শ্রীভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ ঈদৃশ সুবি-

স্তৃত মল্লিকবংশও সুরারাক্ষসীর অদম্য প্রভাবে একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ মহৎ বংশ এত হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইয়াছে, সুরাই তাহার একমাত্র কারণ। কি অশুভ লগ্নেই সুরারাক্ষসী এমন সোনার সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার মৃত্যুসঞ্চারিণী কুলক্ষয়কারিণী শক্তি কেমন অল্পে অল্পে সঞ্চারিত হইয়া মানবকুলকে চিরতরে ধনেপ্রাণে বিনাশ করিতেছে। অপরিণামদর্শী হতভাগ্য মানব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও অন্ধের ন্যায় ইহার কুহকে পতিত হইতেছে। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের স্ত্রীপুত্রের হৃদয়বিদারক করুণ-বিলাপ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতঃ অকৃতকার্য্য হইয়া মৃণ্ময়ী পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতেছে ; অথচ তাহাদের চণ্ডালহৃদয় পিতা সুরারাক্ষসীর প্রিয়-ভক্ত হইয়া অর্থের দারুণ অসদ্ব্যবহার করিতেছে। কোথাও বা পতিগত-প্রাণা সাধ্বী রমণী হৃদয়-সর্ব্বস্ব পতির বিপদাশঙ্কায় সারানিশি সেই দুর্ম্মতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে ; কিন্তু হয়ত সেই দুরাচার সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পথিমধ্যে

নৃত্য করিতেছে। হায়! সুরাপানের ফলে ভারত-বাসীর চক্ষের উপর এমন কত দুরাচার অহর্নিশি সংঘটিত হইতেছে, তাহা আর কত লিপিবদ্ধ করিব। দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ! আপনারা সকলে সমবেত চেষ্টা দ্বারা এই সুরারাক্ষসীকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে যত্নবান্ হউন। আর কিছুকাল এরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, দেখিবেন, অচিরকাল মধ্যে এমন সোনার ভারত ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে—ঈশ্বর তাহা না করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

যোগেন্দ্রনাথের সমসময়ে পণ্ডিতগণের সমাগম—চুরির বিচার—যোগেন্দ্র বাবুর প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার—আন্দুল হিতকারী সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ—সভার উদ্দেশ্য—কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিককৃত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভাপতিত্ব গ্রহণ ও সাহায্য দান—ডিষ্ট্রীক্ট কমিটির মেম্বর—হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আন্দুলে আগমন—জাতীয় ভাষার প্রতি যোগেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা—জুরি পদে অভিষেক—বিদ্যালয়ের পণ্ডিত নিয়োগ—পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের সহিত কবিতা প্রসঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর—ভঙ্গশ্লোক পদপূরণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সাধুহৃদয় যোগেন্দ্র নাথ বৈষয়িক কার্য্যে অধিক দিন মনোনিবেশ করেন নাই। জীবনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রচিন্তায় ও বহু দিক্‌দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সদালাপে ক্ষেপণ করিতেন। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা যেমন অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক বহুগুণযুক্ত পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক পরিশোভিত হইত, আন্দুলের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথের বিরাম মন্দিরও সেইরূপ মহামহোপাধ্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন বুধ সমূহের প্রতিভা বিস্তারের একমাত্র স্থান ছিল।

তৎকালে যে কোন স্থান হইতে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি আসিতেন, সকলেই যোগেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ওজস্বিতা, অসামান্য বাক্‌পটুতা, রচনা চাতুর্য্যের উৎকর্ষতা ও অসামান্য ধীরতা, লোক-প্রিয়তা প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া একবাক্যে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইলে অনেক সুশিক্ষিত সাধুপুরুষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। ফলতঃ ইহাঁর সময়ে আন্দুলে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের সমাগম হইত এবং সকলেরই বিশ্রামস্থান যোগেন্দ্রনাথের বিরাম মন্দিরেই নির্দ্দিষ্ট হইত। তিনি অপর সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দেরও উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার এমন একটী অসাধারণ গুণ ছিল যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি নির্ধন, কি ধনী সকলেই তাঁহার নিকট অকপটভাবে স্ব স্ব মনোভিলায প্রকাশ করিয়া ফেলিত এবং তিনিও তাহাদিগের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া

বিপন্ন ব্যক্তির বিপদোদ্ধারের নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা করিতেন।

এইস্থলে তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিব, তাহা দ্বারা তাঁহার বালকপ্রীতি ও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি দয়ার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি প্রায়ই প্রাতে ও অপরাহ্ণে একটু একটু ভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি অপরাহ্ণে উদ্যান বাটীকার উপরের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া কতকগুলা লোক গোল করিয়া যাইতেছে দেখিলেন। তিনি নিকটস্থ একজন পরিচারককে উহার কারণ জানিতে বলিলেন। পরিচারক সমস্ত বৃত্তান্ত অবিগত হইয়া বাবুকে বলিল যে, "একটী ১৬।১৭ বৎসরের বালক ময়রার দোকান হইতে খাবার চুরি করিয়া খাইয়াছে, ময়রা জানিতে পারিয়া কনষ্টেবলকে দিয়া তাহাকে থানায় পাঠাইতেছে।" বাবু এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "ওদের এখানে আস্‌তে বল ;" তাহারা সকলেই বাগানে আসিল। তখন তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে

বলিলেন,"বাপু দোকানদার! তুমি এই বালকটীকে লইয়া পেয়াদাদিগের লাল পাকড়ীরূপ ধ্বজার পৎ পৎ শব্দের পরিবর্ত্তে কল কল শব্দ করিয়া কোথায় যাইতেছ?"

দোকা। মহাশয়! এই বালক আমার দোকান হইতে খাবার চুরি করেছে, আমি একে শাসন করিবার জন্য পুলিশে দিতে যাচ্ছি।

বাবু। বাপু, এব্যক্তি খাবার চুরি ক'রে খেয়েছে দেখে তোমার কিছুমাত্র দয়া হল না? যখন ও হতভাগ্য খাবার চুরি করিয়া খাইতেছিল, তখন উহাকে আরও কিছু খাবার দিয়া চুরি করা যে দোষ তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি তা না করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর ও পাষণ্ডের ন্যায় উহাকে পুলিশের হাতে দিতেছ? তুমি কি বাপু, আপনার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে না? ও না হয়, পেটের জ্বালায় একদিন চুরি কর্‌তে গিয়া অনভ্যাসের দরুন তোমার নিকট ধরা পড়েছে, আর তুমি যে বাপু, প্রত্যহ তোমার ঐ দাঁড়ী ঘুরাইয়া কতশত লোককে প্রতারণা ক'রে সর্ব্বনাশ কর্‌ছ, তাকি একবারও ভাব না?

তোমাকে কে কতবার জেলে দেয় বলত ? তুমি কি চোর নও ? তুমি যে পাকা চোর। তোমার মত চোরের কোথায় শাস্তি হবে জান ? সে জেল যে আরও ভয়ানক ও অনন্ত যাতনাপ্রদ। যদি না জান, আমার কাছে আর এক সময়ে আসিও, আমি তোমাকে ভাল ক'রে বুঝায়ে দিব। ও না হয়, একদিন তোমার লাভের অংশের কিছু খাবার খেয়েছে ; তুমি প্রত্যহ কত লোকের লাভের অংশ প্রতারণা করিয়া লও। যাই হউক, এখন বল, ও কত টাকার খাবার খেয়েছে ?

দোকা। হুজুর, বেশী নয়, প্রায় আট দশ পয়সা খেয়েছে।

বাবু। এর জন্য তুমি একটা লোককে চির-জীবনের মত নষ্ট করতে বসেছিলে ? তোমার কি বাপু পুত্র নাই ? সে যদি এরূপ করত, তা হলে কি করতে ? যাই হউক, আমি তোমাকে এই আট আনা পয়সা দিতেছি—যাও। আদালতে গেলে ত তুমি এ আট আনা পেতে না, কেবলমাত্র চোরের কিঞ্চিৎ সাজা হইত। আবার এরূপ ঘটিলে অগ্রে তুমি আমার কাছে এস।

দোকানদার বাবুর সদাশয়তা দেখিয়া সেই আট আনার পয়সা লইয়া আনন্দিত চিত্তে আত্ম-দোষ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার প্রচুর সুখ্যাতি করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদনন্তর তিনি সেই বালকটীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাপু, তুমি কেন এরূপ কাজ করলে?" সে বলিল, "মহাশয়, আজ আমি সমস্তদিন কোন আহার না পাওয়ায়, পেটের জ্বালায় কাতর হ'য়ে এরূপ করেছি। আমি অন্য কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এরূপ কুকাজ করিনি; তা হ'লে এত দোকান থাকিতে খাবারের দোকানে এরূপ করিব কেন।"

বাবু বলিলেন, "তুমি কত খাইতে পার বল, এখনি আনাইয়া দিতেছি। সামান্য দ্রব্যের জন্য কেন চুরি করিতে গিয়াছিলে? এখানে আসিলে কিম্বা কোথাও ভিক্ষা করিলেও খাবার পাইতে।" বালকটী বাচাল ও ঈষৎ বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিল; সে বলিল, "মহাশয়, আপনি বলিলেন, সামান্য দ্রব্যের জন্য কেন চুরি করিলে? কিন্তু হুজুর, উদরের জ্বালা সামান্য নয়, দ্রব্যটী সামান্য বটে। আর আমার ভাগ্যক্রমে ইহা সামান্য উপায়ে সংগ্রহ করিতে

পারি নাই। এই ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ প্রাণীই ছার উদরের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। কেহ বা জজ, কেহ বা উকিল, কেহ ডাক্তার, কেহ জমিদার, আবার কেহ বা সামান্য মুটের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। কেবলমাত্র হত-ভাগ্য আমি বিশেষ কোন চিহ্নিত পোষাক পরিধান করিতে না পারিয়া, এই ছেঁড়া কাল কাপড় পরিয়া উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়া ময়রার দোকানে পড়েছিলাম। তা যাই হোক, কার্য্য প্রায় একই। প্রভেদের মধ্যে তাহাদের কিঞ্চিৎ আদান প্রদান আছে, আমার সেইটী নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আমার অল্প ক্ষুধা অল্প পরিমাণ দ্রব্যেই উপশম হয়; তাহাদের অধিক ক্ষুধা, সুতরাং অনেক কল, কৌশল ও নানাবিধ বেশ পরিবর্ত্তন করতে হয়। আবার পক্ষান্তরে ইহাও বলি যে, উদরের জ্বালা না থাকিলে জগৎ কখনই এরূপ ভাবে পরিচালিত হইত না, আর আজ আমিও কখন আপনার নিকট এরূপ জঘন্যভাবে

আসিতাম না; তবে কথা হতেছে যে, পরের দ্রব্য চুরি করা ভাল নয়। কিন্তু হুজুর, জিজ্ঞাসা করি, পরইবা কে আর আপনই বা কে? আমি ত ইহা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। যখন আপনিও মানুষ এবং আমিও মানুষ, তখন উভয়ই এক। তবে এর মধ্যে আপন পর আবার কি? তবে আপনি না হয়, সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনাঢ্য লোকের সন্তান; আর আমি না হয়, নীচ-কুলোদ্ভব দরিদ্রের পুত্র। আপনাতে আমাতে এইমাত্র অনুপাতে বিভিন্ন, এজন্য আপনি কি অগাধ বিষয় লইয়া অপরিমিত ব্যয় করিবেন? আর আমি কিনা উদরের জ্বালায় একান্ত অধীর হইয়া একটা পয়সার জন্য লালায়িত হইব? আপনাদের ত অভাবের অতিরিক্ত লওয়া হয়েছে; কিন্তু আমাদের মত লোকের কোন অভাবই পূরণ হয় না। স্থূল কথা এই যে, আপনারা আমাদের বিষয় রক্ষা করিতেছেন; আমরা সহজে না পাইলে কৌশল করিয়া লুইতেছি। সে যাহা হউক, মহাশয় অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কিঞ্চিৎ খাবার দিন, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে।"

যোগেন্দ্র বাবু বালকের এই কথা শুনিয়া যার-পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে, বালকটীর কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, তবে দীনাবস্থা বশতঃ বুদ্ধির এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার জন্য খাবার আনাইয়া ভাল করিয়া খাওয়াইলেন। আহারের পর তাহাকে আট আনা পয়সা ও একজোড়া কাপড় দিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর না করে, তজ্জন্য তাহাকে কিঞ্চিৎ নীতিগর্ভ উপদেশও দিলেন। আর মধ্যে মধ্যে তাহাকে আসিতে বলিলেন; তৎপরে কনেষ্টবলকে ডাকিয়া, তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ বলিতেন, যাহাদের সংসারে বহুদিন অবস্থান করিতে হইবে, তাহারা যদিও কার্য্যগতিকে হঠাৎ কোন একটা কুকার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহাদের চিরজীবনের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা কোনমতে কর্ত্তব্য নয়। যোগেন্দ্রনাথ দণ্ডার্হ ব্যক্তির ভবিষ্যতের দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখিতেন।

নিম্নে তাঁহার জীবনের আর একটী ঘটনা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিলে অবগত হইবেন যে, তিনি কীদৃশ দয়াপর প্রজা-রঞ্জক জমিদার ছিলেন।

একদা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বাবু, কোন প্রজার নিকট অনেক টাকা খাজানা বাকি পড়ায়, কোন বিশ্বাসী আমলাকে বলিলেন, "তাহাকে এখানে আনাইয়া খাজানা আদায় করিয়া লও।" বাবুর আদেশ, কর্ম্মচারী কি করিবেন। অগত্যা তিনি সেই প্রজার বৈষয়িক দুরবস্থা অবগত হইলেও দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে "আনন্দধামি" বাটীতে ডাকাইয়া আনাইলেন। সে সময় যোগেন্দ্র বাবু গোলাপবাগানের বাটীতে থাকিতেন। কর্ম্মচারী সেই গরীব প্রজাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজার কিছুই নাই, সে কি করিবে—সম্বলের মধ্যে অপরিমিত অশ্রুজল ও কাকুতি মিনতি। এরূপ করদানে কি জমিদারের ধনাগার পূর্ণ হইতে পারে? এইরূপ কাকুতি মিনতি হইতে ক্রমে কোলাহল হইতে লাগিল। দয়ালহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ উপর হইতে এই গোল-

গোল শুনিয়া নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে? এত গোল কেন?" কর্ম্মচারী বলিলেন, "মেজ বাবু মহাশয় আজ্ঞা করিয়াছেন যে, 'এই প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া লইতে হইবে। আমি উহাকে ডাকাইয়া আনিয়াছি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলে যে, উহার এমন কিছু নাই যে খায়।" তখন পরদুঃখকাতর যোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মচারীকে বলিতে লাগিলেন, "তোমার কি দয়ামায়ার লেশমাত্র নাই? দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, ঐ ব্যক্তি বস্ত্রাভাবে একখণ্ড ছিন্ন কন্থা পরিয়া আছে—আহারাভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়েছে; এর উপরি আবার উহাকে সংসার প্রতিপালনের জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতে হয়। এত অবশ্য-প্রয়োজনীয় অভাব থাক্‌তে ও কিরূপে খাজানা দিবে? তবে বাবুর আদেশ রক্ষা করিতে হয়, প্রজাকে আনাইয়া বাবুর কাছে প্রজার দুরবস্থা সমুদয় বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেই ত হইত—তোমার দোষও হইত না এবং প্রজাও নিষ্কৃতি পাইত।" তদনন্তর তিনি প্রজাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি

তোমাকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, এবার হইতে প্রতি বৎসর খাজানা দিয়া যাইবে। যদি কোন কারণে কোন বৎসর খাজানা দিতে না পার, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে আমাকে জানাইও।” প্রজাকে এইরূপ স্নেহমাখা উপদেশ দিয়া এবং তাহাকে উত্তমরূপ আহার্য্যদ্রব্য ও এক যোড়া কাপড় দিয়া বিদায় দিলেন। প্রজাও আনন্দগদগদচিত্তে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। এইরূপে তিনি অনেক প্রজাকে খাজানার দায় হইতে অব্যাহতি দিতেন। তিনি জমিদারী-সংক্রান্ত কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন না বটে; কিন্তু কোন প্রজার বিপদবার্ত্তা শুনিলে অথবা আমলা বা গোমস্তা কর্ত্তৃক কেহ উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। তখন তিনি সকল ভুলিয়া গিয়া তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেন না। দানবীর যোগেন্দ্রনাথের অপরিমেয় করুণা সাধারণ প্রজামণ্ডলীর প্রতি অযাচিতভাবে ব্যয়িত হইত বলিয়া অনেক স্বার্থপর অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারী

আপনাদিগের মনোভিলায পূরণের অবকাশ পাইত না। তিনি যেমন এক পক্ষে ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজা-রঞ্জক ছিলেন, তেমনি অপর পক্ষে সত্যনিষ্ঠ ও সুবিবেচক ছিলেন। এবম্ভূত গুণপরম্পরায় ভূষিত থাকায়, তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বগ্রামস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলীকে বিদ্যালঙ্কারভূষিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেশহিতৈষিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মহামতি যোগেন্দ্রনাথ আন্দুলের অন্যতম উদ্যোগী-পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিকের পৃষ্ঠপোষক হইয়া এক মহৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইলেন। "যে-সাধু উদ্যম এক সময়ে সমস্ত আন্দুল ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহের অধিবাসীবৃন্দকে সামান্য কারণে রাজদ্বারে অজস্র পরিমাণে অর্থনাশজনিত সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; যে উদ্যম এক সময়ে আন্দুলবাসী জনসাধারণের হৃদয়ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ প্রেম ও অনন্তশান্তির চির-বাসস্থান করিবার

প্রয়াস পাইয়াছিল এবং যে উদ্যম এক সময়ে

* * *

আন্দুলকে স্বরলোক সদৃশ করিবার উপক্রম করিতেছিল ;” সে উদ্যমটী আর কিছুই নয়, সেটী তাঁহাদের উভয়ের মহান্ হৃদয়ের চিহ্ন স্বরূপ “আন্দুল হিতকরী সভা।” খৃঃ ১৮৭০ অব্দে আন্দুল নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে যোগেন্দ্র বাবু সভাপতির এবং কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সম্পাদকের পদগ্রহণ করিয়া উক্ত সভার প্রথম অধিবেশন করেন। ন্যায়পরায়ণ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন ও ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতি আন্দুলের অনেক কৃতবিদ্য সদাশয় ব্যক্তি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। যদি ইহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত না হইত, তাঁহা হইলে উক্ত সভাটী যে মহাত্মাদ্বয়ের একটী অক্ষয় কীর্ত্তিদণ্ড স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিত, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি বাঙ্গালি-স্বভাবসুলভ একতাহীন দেশবাসীগণের বৃথা কুচক্রে এবম্ভূত সাধু অনুষ্ঠান অকালে বিলুপ্ত না হইত, তাহা হইলে আন্দুল আর এক নূতন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইত ; আন্দু-

লের প্রত্যেক গৃহ সুখশান্তির বিরামমন্দির হইয়া গ্রামমাত্রের আদর্শ স্থানীয় হইত। কিন্তু বিধাতা আমাদের ভাগ্যে তাহা লেখেন নাই। ঊষরক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। নিম্নে সভার মহৎ উদ্দেশ্যগুলি প্রকটিত হইল।

১ম। দেশবাসীগণ সামান্য কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসার নিমিত্ত রাজদ্বারে না যাইয়া সভাকে অবগত করাইবেন। সভা মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া ন্যায় বিচার দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিবেন।

২য়। যে সমস্ত অল্পবয়স্কা বালবিধবা সংসারে উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং উদরের জ্বালায় লালায়িত হইয়া সভাকে জ্ঞাপন করিবেন,তাঁহাদের ভরণ পোষণার্থে সভা মাসিক সাহায্য দান করিবেন।

৩য়। পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা ও তাহাদের প্রতিপালনের সুবন্দোবস্ত এই সভার দ্বারা করা হইবে।

৪র্থ। অন্ধ, খঞ্জ, পরিশ্রমে অপারগ বৃদ্ধদিগের অভাব দূরীকরণে সভা যথাসাধ্য যত্নশীল হইবেন।

৫ম। দেশ মধ্যে কোনও ভদ্র পরিবার পীড়াগ্রস্ত বা অন্য কোন কারণে উপায়বিহীন হইয়া সভাকে জ্ঞাপন করিলে সভার প্রতিষ্ঠিত "অনাথ-ভাণ্ডার" হইতে তাহাদের সাহায্য দানে সচেষ্ট হওয়া যাইবে।

এবম্প্রকার শুভ নিয়ম সংস্থাপনের দ্বারা যোগেন্দ্রপ্রমুখ সদাশয় ব্যক্তিগণ দেশ মধ্যে সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্যক্ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সর্ব্বকামনাপরিশূন্য বুদ্ধ, ধার্ম্মিকবর কবীর ও নানক, ভক্তির অবতার চৈতন্য ও জ্ঞান-বীর রামমোহন প্রভৃতি ভক্তপ্রবর ধর্ম্মপরায়ণ দেশহিতৈষী মহাপুরুষেরা যে দেশকে কর্ত্তব্যের পথে চালাইতে সম্যক্ প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সে দেশে যে যোগেন্দ্রপ্রমুখ ব্যক্তিগণ এরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, সে আশা নিতান্তই সুদূর-পরাহত।

তদনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয় খৃঃ ১৮৭৭ অব্দে সাধারণ দরিদ্রবৃন্দের উপকারার্থে যখন দাতব্য চিকিৎসালয়রূপ মহান কার্য্যের অবতারণা

করেন, তখন তিনি মহামতি যোগেন্দ্রনাথকে আন্দুলের সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে প্রধান উদ্যোগী জানিয়া, উক্ত কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আহূত সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। এই কার্য্যে যোগেন্দ্র বাবু যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। চিকিৎসালয়টী সম্যক্‌রূপে নির্ম্মাণ করিতে অনেক সময়সাপেক্ষ বলিয়া তৎকালীন কার্য্য-পরিচালনের জন্য তিনি মহিয়াড়িস্থিত একটী বাড়ী ছাড়িয়া দেন। তিনি এই সকল সাধারণ-হিতকর কার্য্যে অনেক সময় অনাহূত হইয়াও কায়িক ও আর্থিক সাহায্যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ কার্য্যপরম্পরায় ইনি যেমন সাধারণ লোকসমূহের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ রাজপুরুষদিগেরও সম্যক্ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেমন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড নামক 'কমিটীর দ্বারা প্রতি জেলায় সাধারণ-হিতকর কার্য্যসমূহ পরিদর্শন করিতেছেন, তৎকালে এই বোর্ডের অনুরূপ একপ্রকার কমিটী নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই কমিটীতে প্রতি জেলার

প্রধান প্রধান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ সভ্য নির্দ্দিষ্ট হইতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের দ্বারা জেলার বহুল অভাব পূরণ করিয়া লইতেন। আমাদের যোগেন্দ্রনাথ এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি অনেক কার্য্যে প্রজাসাধারণের হইয়া গভীর বিবেচনার সহিত মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণে তিনি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্ম-চারীর নিকট বিশেষরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুনির্ম্মল যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অনেকানেক পণ্ডিত এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একদা হাবড়া জেলার মাজিষ্ট্রেট্ লোকপরম্পরায় যোগেন্দ্রনাথের সদ্গুণনিচয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক একখানি পত্র লেখেন। যোগেন্দ্র বাবু পত্র পাঠে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের যে দিবস আসি-বার কথা ছিল, কার্য্যগতিকে সে দিবস তিনি না আসিয়া তৎপর দিবস বেলা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অশ্বারোহণে একবারে গোলাপ বাগানের

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন যোগেন্দ্র বাবু বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ হঠাৎ আসিয়াই তাঁহার সহিত ইংরাজিতে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত বাঙ্গালায় উক্ত প্রশ্নোত্তরের অনুবাদ করিয়া দিলাম্।

মাঃ। এ বাটীটী কাহার ?

বাঃ। ৺জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের।

মাঃ। জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিককে এখানে আমার আবশ্যক নাই; আন্দুলের যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাটী কোথায় ?

বাঃ। বাটী জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের, যোগেন্দ্র মল্লিক এইখানে থাকেন।

মাঃ। তিনি কোথায় ?

বাঃ। এইখানেই আছেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঘোড়া হইতে অবতরণ করুন; আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতেছি।

মাঃ। আপনি কে ? আপনার নাম কি ?

বাঃ। আমি জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের

জ্যেষ্ঠ পুত্র ; আমার নামই যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক। ইহা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার উদার ও অহঙ্কারশূন্য ব্যবহার দেখিয়া বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, "আপনি যথার্থই একজন ভদ্রপ্রকৃতি বিনয়ী ব্যক্তি। আপনার এই সাধু ব্যবহারে অসামান্য বুদ্ধিমত্তার ও দুর্লভ উচ্চশিক্ষার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আপনি যে সহজে পরিচয় দেন নাই, আপনার ঐকান্তিক অহঙ্কারশূন্যতাই তাহার একমাত্র কারণ। আর জাতীয় ভাষা যে কি বস্তু এবং জাতীয় ভাষার গৌরব রক্ষা করিলে স্বজাতীয় গৌরব কি প্রকার সংরক্ষণ করিতে পারা যায়, তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। বাবু এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহাশয় ইহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন। আমার ইংরাজিতে উত্তর না দিবার কারণ আপনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন। আপনি ইংরেজ, আপনি আপনাদের ভাষায় কথা কহিয়া আপনাদের জাতীয় ভাব রক্ষা করিলেন,

আর আমি হিন্দু, আমার জাতীয় ভাষা সংস্কৃত; সুতরাং আমি আমার ভাষায় উত্তর না দিয়া কেন আমার জাতীয় গৌরবের মস্তকে পদার্পণ করি।” বিবেচক মাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার জাতীয় ভাবের ঐকান্তিকতা দেখিয়া আরও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “যেমন অগ্রে মাতৃভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা সহজ ও সুখকর হয় না এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতে কাহাকেও পূর্ণমনোরথ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ অগ্রে স্বজাতীয় আচার-প্রণালী ও সামাজিকতা শিক্ষা না করিয়া, বিজাতীয় আচার ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাহা করিতে গেলে অনুকারী ব্যক্তি ভাল মন্দ বিচার করিতে না পারিয়া এক প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার ব্যক্তি হইয়া পড়ে; কিন্তু আপনার ব্যবহারে আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম।” তদনন্তর যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিশ্রামার্থে তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন।

মাজিষ্ট্রেট্ আসিয়া স্থানে স্থানে পত্র পুষ্প গুল্মসমূহ যথাবিধি সংরক্ষিত দেখিলেন। গৃহের মধ্যে উত্তম কম্বল পাতা তদুপরি স্থানে স্থানে সংস্কৃত পুস্তক সমূহ স্তবকে স্তবকে সজ্জিত দেখিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যোগেন্দ্রনাথের বসিবার ঘরে ভিত্তিগাত্রে "সত্যম্ বলম্ কেবলম্" "সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ" "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "একমেবাদ্বিতীয়ং" এইরূপ নীতি-গর্ভ উপদেশমালা কাগজে লেখা রহিয়াছে; তাঁহার আসনের নিকটে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মস্যাধার ও কয়েকটী কঞ্চির লেখনী সজ্জীকৃত আছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহার বৈঠকখানা গৃহটী শাস্ত্র-ব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের আবাস-মন্দির। ফলতঃ তাঁহার কার্য্য ও আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলে তিনি যে বিশেষ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সাধারণতঃ এ প্রকার ঘটিয়া থাকে, যে ব্যক্তি এক মতের পক্ষপাতী হন, সে ব্যক্তি অন্য মতকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ন্যায়দর্শী যোগেন্দ্রনাথ সে প্রকৃতির লোক

ছিলেন না। তিনি যেমন হিন্দুর আচার-প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন, তেমনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার-প্রণালীর প্রতিও কিছুমাত্র বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না।

সাহেব সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ জানিতেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত সংস্কৃত চর্চ্চা করিলেন। তাহার পর যোগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেলেন। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকের আবশ্যকীয় বাইবেল প্রভৃতি দ্রব্য-নিচয়ে গৃহটী সজ্জিত রহিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহা দেখিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে বলিলেন, "মহাশয়! ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, আপনি তাহা উত্তম-রূপে পরিজ্ঞাত আছেন। আমি জানি, ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিরা কখনই ধর্ম্ম বিশেষকে নিন্দা বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। আপনাকে একটী উচ্চ অঙ্গের উপাসক দেখিতেছি। হিন্দুর যাহা আবশ্যক, তাহা আপনার সংগ্রহ করা আছে এবং আমি একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ—আমি আপনার সহিত দেখা করিতে

আসিব বলিয়া, আমার আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি আপনি আগ্রহ-সহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে এমন সকল দ্রব্য বর্ত্তমান আছে, যাহা আপনার ন্যায় হিন্দুর পক্ষে সংগ্রহ করা কষ্টকর। কিন্তু তাহাও আপনি সংগ্রহ করিয়া আপনার সমদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই আপনার আদরের বস্তু। আমি হাবড়া জেলার মধ্যে বহুকাল কার্য্য করিতেছি ও অনেক ভদ্রপ্রকৃতি জমিদার ও ধনাঢ্য লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বিবেচক সাধু হিন্দুর সহিত কখনও সাক্ষাৎ করি নাই।”

তৎপরে তিনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশ্রামান্তর আন্দুলের রাজবাটীতে গমন করিলেন। তাঁহার পথকর-সংক্রান্ত কিছু কার্য্য ছিল। এজন্য আন্দুলে কিছুদিন থাকিবার আবশ্যক হয়। এই কারণে, তিনি “গোলাপ বাগানে” পনর দিন অবস্থিতি করেন।

ইহার কিছুকাল পরে যোগেন্দ্র বাবু “দায়রার” (জুরী পদে) উপবিষ্ট হইবার নিমিত্ত উপরিতন

কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক মনোনীত হন। তিনি তাহা অবগত হইয়া, অনবকাশ ও শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়া, উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ আগ্রহে তাঁহাকে জুরীপদ গ্রহণে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। পরন্তু, তিনি তাঁহার অত্যধিক দয়া ও চক্ষুর্লজ্জা প্রযুক্ত অধিককাল ঐ কার্য্য করিতে পারিলেন না। একদা মহিয়াড়ী নিবাসী কোন ব্যক্তি, জনৈক বিধবা স্ত্রীলোকের টাকা গচ্ছিত রাখিয়া প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। উক্ত বিধবা, প্রথমে যোগেন্দ্র বাবুর নিকট অভিযোগ করায়, তিনি উক্ত ব্যক্তির অসরল ব্যবহারে বিধবাকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির কার্য্যদোষে তাহাকে দায়রা সোপরদ্দ করা হয়। ঘটনাক্রমে যোগেন্দ্র বাবু সেবারকার দায়রার একজন জুরর ছিলেন। সে তাহা অবগত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে; কিন্তু যোগেন্দ্র বাবু তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, তিনি সত্যের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিবেন না। পর

দিবস বিচারালয়ে তাহার কারাবাসের আদেশ হওয়ায়, সে কেবল যোগেন্দ্র বাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কারাগারে গেল। এই ঘটনায় যোগেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। এতদ্ব্যতীত তিনি সেই ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের করুণ-ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া জুরী-পদ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন।

আজ কাল লোকে দেশের মুখ্য-পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য যে পদ আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করে, তিনি এরূপ গৌরবজনক পদও হৃদয়ের দয়াপ্রবণতা বশতঃ পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না।*

নিম্নে তাঁহার সৌজন্য প্রভৃতি গুণের পরিচায়ক কয়েকটী গল্প উল্লিখিত হইল।—

এক সময়ে তৎপ্রতিষ্ঠিত আন্দুল স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায়, তিনি কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট একজন উপযুক্ত পণ্ডিত প্রার্থনা করেন। তাহাতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় আসিয়া তাঁহার

* তৎকালে জুরীর পদ বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল।

সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর তিনি বলিলেন, "সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাকে পাঠাইয়াছেন, আপনাকেই নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে আর একটী লোক এই পদের প্রার্থী হইয়া একখানি আবেদন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দুইটী কবিতাও রচনা করিয়া পাঠান। তখন এ পদ শূন্য ছিল না। এক্ষণে তাঁহাকেই নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহার ঠিকানাটী মনে নাই, নামটী মনে আছে; তাঁহারও নাম শ্যামাচরণ। আবেদন পত্রখানি অনেক খুঁজিলাম, কোথায় কিরূপে হারাইয়া গিয়াছে, পাইলাম না। কবিতা দুইটী পাইয়াছি,—সেই লোকটীকে নিযুক্ত করিতে পারিলেই সুখী হইতাম" ইহা শুনিয়া উক্ত কবিরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, "আমিই আবেদন করিয়াছিলাম; আপনার প্রত্যয়ার্থ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, কবিতা দুইটী সমগ্র আমার মনে নাই; কিন্তু দুই একটী কথা মনে পড়িতেছে ও ভাবটী বেশ মনে আছে।" এই বলিয়া তাঁহার যাহা মনে ছিল বলিলেন। বাবু মহাশয়ও সেই কবিতা দুইটী

বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। সেই কবিতা দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"যোগেন্দ্রনাথো দ্বিজরাজসেবী
তমঃপরো জ্ঞানদয়াসমেতঃ।
ভোগান্বিতোঽয়ং গুণিপুঙ্গবশ্চ
স দেবদেবো জয়তি ত্রিলোক্যাম্।"

যিনি ব্রাহ্মণদিগের সেবা করেন, যিনি অহঙ্কার শূন্য, যিনি জ্ঞান ও দয়াযুক্ত, যিনি ভোগে রত ও গুণী-শ্রেষ্ঠ, সেই দেবতুল্য যোগেন্দ্রনাথ জগতে জয়যুক্ত হউন।

"শীর্ষে যস্য পদামৃতং মুররিপোঃ কণ্ঠে চ তৎপ্রেয়সী
বৈরঞ্চ ত্রিপুরে মুখে শশিবিভা গেহং বিভূত্যাচিতম্।
সংখ্যাবদ্গণবেষ্টিতঃ প্রতিমুহুঃ কামাবসায়ী চ যঃ
শ্রেয়াংসং পুরুষং তমেব সততং স্বশ্রেয়সে সংশ্রয়ে।"

যাঁহার মস্তকে শ্রীহরির চরণামৃত, যাঁহার কণ্ঠে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, ত্রিভুবনে যাঁহার বীরত্ব, মুখে যাঁহার চন্দ্রের ন্যায় কান্তি, যাঁহার গৃহ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, যিনি প্রতিক্ষণ পণ্ডিতগণে পরিবেষ্টিত আছেন এবং যিনি কাম রিপুকে জয় করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ যোগেন্দ্র-

নাথকে আমি নিজের শ্রেয়োলাভের জন্য আশ্রয় করি।

যোগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং চর্চ্চা ছিল। মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ায় সে চর্চ্চা কতক কমিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে উক্ত কবিরত্ন মহাশয়কে পাইয়া আবার সেই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। পরে মধ্যম সহোদর স্বহস্তে সমস্ত বৈষয়িক ভার গ্রহণ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি তাঁহার অনেক পড়া ছিল—সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন ও সংস্কৃত কবিতা রচনাতেও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহার রচিত যে কয়েকটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে,—তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল—

মাতালের বর্ণনা।

"মদ্যপঃ পরমঃ সাধুর্বিকারো নাস্তি চেতসঃ
বিষ্ঠাকুণ্ডে পতয়ন্তি শ্বা মুখে মূত্রয়ত্যসৌ।"

কলেরগাড়ী বর্ণনা।

"ইয়ং বাষ্পরথশ্রেণী সবেগং যাতি সস্বনম্
বিপক্ষাক্রমণার্থায় সযূথ করিরাজবৎ।"

এই কলের গাড়ী সারি সারি সশব্দে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন গজরাজ সদলবলে বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে।

এক সময় তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পরস্পর কলহ উত্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট আবেদন করায়, তিনি এই কয়েকটী কবিতা লিখিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

"ছাত্রাঃ শৃণুত মদ্বাক্যমৈক্যং প্রাপ্য পরস্পরম্
যূয়মত্র সমেতাঃ স্থ বিদ্যার্ণবতিতীর্ষবঃ।
যথা বিহঙ্গমা বৃক্ষে মিলন্তি বিবিধা নিশি
যান্তি স্বেষ্টা দিশঃ প্রাতঃ কা কস্য পরিদেবনা।
দিনানি স্বল্পমাত্রানি স্থায়িনামিহ বস্তথা
দ্বেষিতা নোচিতা বৎসাঃ সুকুমারধিয়াগতঃ।
শিক্ষকানাং বশে সন্ত সম্মানয়ত তান্ সদা
ভক্তিমন্তো বচস্তেষাং পরিপালয়ত ক্ষণাৎ।
উপার্জ্জয়ত যত্নেন বিদ্যাবত্নং মহাধনম্
চৌরৈর্নহ্রিয়তে যচ্চ জ্ঞাতিভির্নচ বণ্ট্যতে।
শয়নাসনশঙ্কাদিসামান্যাৎ পশুমর্ত্ত্যয়োঃ
যেন হীনোঽধমো মর্ত্ত্যো দ্বিপদঃ পশুরুচ্যতে।
পরোপকারিণঃ সত্যবাদিনশ্চ জিতেন্দ্রিয়াঃ
সভ্যাশ্চরত সৎকার্য্যাণ্যন্যারতমতন্দ্রিতাঃ।"

অর্থাৎ হে ছাত্রগণ, তোমরা আমার কথা শুন।

তোমরা সকলেই বিদ্যারূপ সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক, সুতরাং পরস্পর ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মিলিয়া মিশিয়া থাক। যেমন বিবিধ পক্ষীগণ রাত্রে কোনও বৃক্ষে আসিয়া মিলিত হয় এবং প্রাতঃকালে স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করে, কাহারও জন্য কাহারও কষ্ট বোধ হয় না, সেইরূপ তোমরাও অল্পদিনমাত্র এখানে থাকিবে, সুতরাং হে বৎসগণ, তোমরা সুকুমারমতি, দ্বেষবুদ্ধি থাকা তোমাদের উচিত নহে। তোমরা শিক্ষকদিগের বশে থাকিবে, সর্ব্বদা তাঁহা-দিগকে সম্মান করিবে এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিবে। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা-রত্নরূপ মহাধন উপার্জ্জন কর, যাহা চোর হরণ করিতে পারে না এবং জ্ঞাতিরাও বিভাগ করিয়া লইতে পারে না। শয়ন, ভোজন, ভয় প্রভৃতি পশু ও মনুষ্যের সাধারণ গুণ; সুতরাং যে সেই বিদ্যাধনে বঞ্চিত হয়, সেই নরাধমকে দ্বিপদ পশু বলা যাইতে পারে। তোমরা পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সভ্য ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া সতত সৎকার্য্য আচরণ কর।

পণ্ডিতদিগের মুখে নূতন কবিতা শুনিতেও তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ ছিল। পাছে কেহ অপ্রস্তুত হন, এইজন্য তিনি কাহাকে কোনও বিষয়ে নিয়োগ করিতেন না, এই একটী তাঁহার মহাগুণ ছিল। তবে কাহারও মুখে তাঁহার যখন কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইত, তখন তিনি তাঁহার নিকট প্রসঙ্গ ক্রমে সেই কথার উত্থাপন করিতেন।

একদিন তিনি গোলাপবাগের পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন, মৎস্যগুলি আসিয়া তাঁহার চারিদিকে উপস্থিত হইয়াছে। উহা দেখিয়া তিনি কবিরত্ন মহাশয়কে বলিলেন,—

"পশ্য পণ্ডিত মৎপার্শ্বে সমেতা মীনমণ্ডলী
তৈলবিন্দূন্ পিবত্যেষা মুখং ব্যাদায় সত্বরম্।"

পণ্ডিত মহাশয় দেখুন, এই মাছগুলি আমার কাছে আসিয়া মুখ বিস্তার করিয়া তাড়াতাড়ি তৈলবিন্দু পান করিতেছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—

"আকণ্ঠমগ্ন বপুষো ভবতোঽতি রম্যং
দৃষ্ট্বা বরাননমিমে কমলানুকারি।

হিল্লোলবেল্লন গলন্মকরন্দবিন্দু
ভ্রান্ত্যা পিবন্তি জলজাঃ খলু তৈলবিন্দূন্।"

আপনি কণ্ঠা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া আছেন, জলের হিল্লোলে আন্দোলিত আপনার মুখখানি পদ্মের ন্যায় মনোহর দেখিয়া, উহা হইতে মধুকণা ঝরিতেছে ভাবিয়া মৎস্যগণ ঐ তৈলবিন্দু পান করিতেছে।

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"পণ্ডিতাঃ প্রায়েণ অত্যুক্তিপ্রিয়া ভবন্তি" (পণ্ডিতেরা প্রায়ই অত্যুক্তি ভাল বাসেন)।

তখন কবিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—

"তথ্যং সমাকর্ণয় তাবদেতৎ
সৌন্দর্য্যলিপ্সা প্রবলা হমীষাম্
ত্বদঙ্গকান্তিদ্রবমেব মত্বা
পিবন্তি তৈলং তব আদরেণ।"

তবে সত্য কথা শুনুন। ইহাঁদের সৌন্দর্য্য লাভের বড়ই ইচ্ছা। সেইজন্য আপনার অঙ্গের লাবণ্য গলিয়া ভাসিতেছে মনে করিয়া, ইহারা আদরপূর্ব্বক ঐ তৈল পান করিতেছে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

"যদিস্থাৎ তথ্যমেবৈতৎ ততো দূরং প্রযান্ত্বিমে
সৌন্দর্য্যং বিমলং হ্যেষাং মৎসঙ্গাৎ কলুষী ভবেৎ।"

যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ইহারা দূরে যাউক। কারণ ইহাদের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য আমার সংসর্গে দূষিত হইয়া যাইতে পারে।

এই বলিয়া মাছগুলিকে তাড়াইয়া দিলেন।

তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া গোলাপবাগের বৈঠকখানা বাটীতেই থাকিতেন। অন্দরবাটীতে যাতায়াত তাঁহার বড়ই কম ছিল। পরে তাঁহার পীড়িতাবস্থায় শুশ্রূষার জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিকটে আসিবার ইচ্ছা জানাইলেও এবং তজ্জন্য অনেকে অনুরোধ করিলেও তিনি প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। পরে সকলে কবিরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, আপনাকে যোগেন্দ্র বাবু যথেষ্ট মান্য করেন এবং আপনার কথাও রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এ প্রস্তাব করিলে অবশ্যই সম্মত হইবেন। তাহাতে কবিরত্ন মহাশয় একদিন তিনটী কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। সে কবিতাগুলি এই,—

"আবাল্যাদভবৎ ভবৎসহচরী যান্তঃপুরে বা পুরে
স্বপ্নে জাগরণে বনে হ্যুপবনে রাত্রৌ তথা বাসরে।
তাং সীতাং বিরহয্য ভো রঘুপতে স্থাতুং কথং শক্যতে
নো বিদ্মো বয়মল্পবুদ্ধয় ইদন্মাত্র প্রমাণং ভবান্ ।১।"

যিনি বাল্যকাল হইতে কি অন্তঃপুরে, কি পুরে, কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কি বনে, কি উপবনে, কি রাত্রে, কি দিনে সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন; হে রঘুপতি। আপনি এখন সেই সীতাকে ছাড়িয়া কিরূপে রহিয়াছেন, আমরা অল্পবুদ্ধি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনিই জানেন।

এই কবিতাটী শুনিয়াই যোগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীকেই ইহাতে সীতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকেই রঘুপতি বলা হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন—"কিমবস্থা হি সাধুনা" (তিনি এখন কি অবস্থায় আছেন?)

কবিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—

"বক্তব্যং কিমু নাথ সা পতিরতা পত্যা বিযুক্তা চিরং
তৎপাদার্পিতমানসা নিশি দিবা কালং নয়ত্যুৎসুকা।

হৃৎপদ্মে বিমলে নিধায় সততং তৎপাদপদ্মদ্বয়ং
ভক্ত্যা পূজয়তি ত্রিসন্ধ্যমধুনা ত্যক্তান্যকর্ম্মা সতী ।২।”

হে নাথ, সে কথা আর কি বলিব? সেই পতিব্রতা সতী পতিসঙ্গবিহীনা হইয়া পতিরই পাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক দিবারাত্রি উৎকণ্ঠিত ভাবে কাল কাটাইতেছেন এবং নিয়ত নিজ নির্ম্মল হৃৎপদ্মে পতির পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া অন্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ত্রিসন্ধ্যা এখন তাহারই পূজা করিতেছেন,—

“নারীণাং নরসিংহ সাধিকতয়া শ্লাঘ্যেতি জানীমহে
সৌন্দর্য্যেণ দমেন চোন্নতধিয়া খ্যাত্যা সতীত্বেন চ।
সেদানীং তব পাদপদ্মযুগয়োঃ সাক্ষাৎ তু শুশ্রূষণং
বাঞ্ছত্যায়তমূর্দ্ধজা, যদি তবাদেশো ভবেৎ তদ্‌বদ ।৩”

হে নরবর, আমরা জানি তিনি সৌন্দর্য্যে, দমে, উন্নত বুদ্ধিতে, যশে ও সতীত্বে নারীদিগের শ্রেষ্ঠ। তিনি আলুলায়িত কেশে আছেন, এখন সাক্ষাৎকারে আপনার পাদপদ্মের সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আপনার অনুমতি হয় কি না বলুন।

কবিতা তিনটী শুনিয়া তিনি পরম প্রীত হইয়া

সেই বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার সহধর্ম্মিণী আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

এইরূপ তাঁহার স্বরচিত ও তাঁহার জন্য রচিত আরও অনেক কবিতা ছিল জানিতাম, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সকলগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

সুপ্রসিদ্ধ "কাদম্বরী" নামক কাব্য অতি সুকঠিন, অথচ তাহার উপন্যাসটী অতি মনোহর। উহা সাধারণের বোধগম্য করণার্থ তিনি কবিরত্ন মহাশয়কে আদেশ করেন। কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার আদেশানুসারে "সরল-কাদম্বরী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং উহা ছাপাইবার সমস্ত খরচও তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ঐ পুস্তক এক্ষণে সংস্কৃতকালেজ প্রভৃতি কোন কোন বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে।

নবম অধ্যায়।

যোগেন্দ্রনাথের পদস্খলন—সুরাপানে তাঁহার বিতৃষ্ণা—অধরমণির স্বপ্নদর্শন—তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—তাঁহার তীর্থভ্রমণ—তাঁহার পীড়া—তাঁহার কলিকাতা গমন।

যেমন পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোতির মধ্য দিয়াও, দুই একটী কলঙ্ক রেখা দেখা যায়, সেইরূপ আমাদের যোগেন্দ্রনাথের জীবনেও দুই একটী কলঙ্কচ্ছায়া প্রতিভাত হইয়াছিল। পানদোষ তাঁহার সুবিমল চরিত্রকে একবার কলুষিত করিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের পর যখন তিনি দুঃসহ শোকভারে সাতিশয় প্রপীড়িত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; যখন সংসারের কোন বস্তুতে তাঁহার চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিল না; এমন কি, এক সময়ে যে সকল বন্ধু ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সুধাময় বচন-মাধুরীতে কত আমোদ বোধ করিতেন, তাঁহারাও যখন তাঁহার শোক অপনয়ন করিতে পারিলেন না, তখন একজন মদ্যপ বন্ধু অবসর বুঝিয়া নানাবিধ প্ররোচনবাক্যে

তাঁহাকে একটু একটু মদ্যপান করাইতে লাগিলেন। কালবিষ এই অবকাশে দুর্লক্ষ্য সূত্রে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পবিত্র শরীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিককাল তাঁহাকে ইহার অধীন থাকিতে হয় নাই। তাঁহার সেই লোকবিশ্রুত বিদ্যা, লোকদুর্লভ বিজ্ঞতা ও অনন্যসাধারণ আত্মসংযমশক্তি ক্রমে ক্রমে সেই সর্ব্বনাশকর হলাহলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রভাবকে বিদূরিত করিতে লাগিল। এমন কি, কিছুদিন পরে মদ্যের প্রতি তিনি এতদূর বীতরাগ হইয়াছিলেন যে, উহার নামোচ্চারণ করিলে অনুতাপে ম্রিয়মাণ হইতেন। কোন কুকার্য্য না করা গৌরবের বিষয় বটে ; কিন্তু কুকার্য্য করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করা আরও গৌরবের বিষয়। সেই পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সকল কার্য্যই মঙ্গলময়। সামান্য মানব বুদ্ধিতে যাহা আমরা নিতান্ত হেয় ও অপদার্থ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি, ভগবান তাহারও ভিতরে নিশ্চয়ই কি অভাবনীয় মঙ্গল সূচনা করিয়া রাখেন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন শোক-

পীড়িত যোগেন্দ্রনাথ মদ্যপ বন্ধুর বচন-মাধুরীতে আপনার মহত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মধুর মদ্যের নবীন প্রণয়ে বিমুগ্ধ হন; তখন তাঁহার সেই অবস্থার মধ্য দিয়া একটী সুমহান্ কার্য্যের অবতারণা হয়। সেই মঙ্গলময় কার্য্যটী তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী অধরমণি মহোদয়া দ্বারা অদ্যাবধি সুনিয়মে পরিচালিত হইয়া স্থানীয় দরিদ্র পরিবারগণের উপকার সাধন করিতেছে।

একটী বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্বদাই যোগেন্দ্র বাবুর নিকট আসিতেন। বিদ্যার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। এতদ্ব্যতীত তিনি ঈষৎ ক্ষিপ্ত ছিলেন। গুণের মধ্যে তিনি কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না ও সর্ব্বদাই আমোদ-আহ্লাদে কাটাইতেন। এজন্য যোগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন ও আদর করিয়া "বিদ্যাসাগর" বলিয়া ডাকিতেন। এই সকল কারণে তিনি তাঁহার যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণটীর কখন কখন একটু আধটু মদ্যপানেও অভ্যাস ছিল। একদা "বিদ্যাসাগর" মদ্যপান করিয়া বাবুর সহিত নানা প্রকার রহস্য

করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হাসিতে হাসিতে আমোদ করিয়া "বিদ্যাসাগরকে" একটী চপেটাঘাত করিলেন। সুরার কি বিচিত্র লীলা! ইহা পান করিবার সময় মনের গতি যে দিকে-যায়, সে দিক হইতে আর তাহাকে কেহই সহজে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মদ্যপানে অনেক ব্যক্তির অন্তরনিহিত প্রচ্ছন্নভাব প্রকাশিত হওয়াতে তাহাদের প্রকৃত স্বভাব জানা যায়। যখন সহজ লোকের এরূপ অবস্থান্তর হয়, তখন একজন অর্দ্ধক্ষিপ্ত যে মদ্যপানে কি অবস্থায় পতিত হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। লোকে কথায় বলে, নাস্তিকের চার্ব্বাক শাস্ত্র পাঠে ও পাগলের মাদকদ্রব্য সেবনে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারই না হইয়া থাকে। এখানেও সেইরূপ ঘটিল। "বিদ্যাসাগর" চড় খাইয়া দুঃখে একেবারে অভিভূত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে উপর হইতে নিম্নে আসিলেন। নিম্নে আসিয়াই "আমায় মেরে ফেল্লে গো, বাবু আমায় মেরে ফেল্লে গো, তোমরা আমায় রক্ষা কর গো" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে রাস্তা দিয়া

আসিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন যে, অন্তঃপুর হইতে দয়াশীলা অধরমণি তাহা শুনিতে পাইয়া নিকটস্থ একজন পরিচারিকাকে বলিলেন যে, "দেখত বাহিরে কি হইয়াছে, কে চীৎকার করিতেছে।" পরিচারিকা জানিয়া আসিয়া যথাযথ সমস্ত বিবরণ অবগত করাইলেন। পতিব্রতা অধরমণি পরিচারিকা দ্বারা "বিদ্যাসাগরকে" বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "কেন বাপু! বাবু তোমাকে মারিলেন?" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাবধি কোন কথা না বলিয়া "তিনি বিনা দোষে আমাকে মারিয়াছেন" এই মাত্র বলিলেন। মহোদয়া অধরমণি ইহার মৌলিক ব্যাপার অবগত হইতে না পারিয়া স্ত্রীস্বভাবসুলভ ধর্ম্মভীরুতাবশতঃ ব্রাহ্মণের অপমানে যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন। ব্রাহ্মণের অপমান করা হইল, সুতরাং বংশের অকল্যাণ হইবে, এইরূপ নানাবিধ আশঙ্কা করিয়া সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে উপস্থিত পরিচারিকাগণের

প্রবোধ বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া "বিদ্যা-সাগরকে" আহার করাইলেন এবং বলিলেন, "বাপু, কাল প্রাতে তুমি এখান হইতে যাবে, আজ আমার এখানে থাক।" "বিদ্যাসাগরের"ও আহারাদির পর মত্ততার হ্রাস হইলে বিশ্রামের আবশ্যক হইয়াছিল; সুতরাং কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

এ দিকে বাবু শুনিলেন যে, "বিদ্যাসাগর" বাড়ীর ভিতর গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিয়াছে, কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তখন বাড়ীর বয়োবৃদ্ধাদিগের মধ্যে অধরমণিই প্রধান ছিলেন। অন্তঃপুরে যাইলে ক্রন্দন পাছে আরও বৃদ্ধি পায়, এই ভাবিয়া তিনি আর তথায় যাইলেন না। সে রাত্রি বৈঠকখানা বাটীতেই অবস্থিতি করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণা অধরমণি সে রাত্রে আর কিছু আহার করিলেন না; কেবল মাত্র এই সুবিস্তৃত বংশের ভাবী পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে সাতিশয় ব্যাকুলা হইলেন। ভবিষ্যতে ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষা কোন প্রকারে নিজে অগ্রসর হইয়া প্রতীকারের

উপায় অনুসন্ধান করা শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। এইরূপ নানা প্রকার ভবিতব্যের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে, মনের মধ্যে এক প্রকার স্থির করিলেন যে, পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে যাইবেন ও কামনা সিদ্ধির উপায় দেখিবেন। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা ও হৃদয়ের অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে সে রাত্রে অধরমণির ভালরূপ নিদ্রা হইল না। রাত্রি শেষে একটু তন্দ্রাসমাগম হইলে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী পরিণামে সফল হওয়ায় আমরা আগ্রহের সহিত তাহা প্রকাশ করিতেছি।

তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন একটী ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "মা। কাল বেলা দশ ঘটিকার সময় একটী অতিথি লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর লইয়া আসিবেন, বাবু তাহা দেখিয়া কিনিবেন। তুমি সেই নারায়ণ জিউকে দেখিয়া গঙ্গাস্নানে যাইও।" তিনি এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া, "বিদ্যাসাগরকে" কিছু পয়সা ও চাউল দিবার আদেশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস

না হওয়ায়, তিনি সে কথা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না ; বরং যত শীঘ্র পারেন, গঙ্গাস্নানে যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের বিশ্বাসী আমলা বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিলেন। সন্তপ্তহৃদয়া অধরমণি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি এখনি গঙ্গাস্নানে যাব ; আপনি বাবুকে বলিয়া আমার জন্য এক-খানা নৌকা আনাইয়া দিন।" কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ বাবুর নিকট গেলেন। বাবু তাঁহার গঙ্গাস্নানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ ত গঙ্গাস্নানের কোনও যোগ নাই, তবে ইচ্ছা করিয়া স্নান করা বৈত নয় ; সে না হয় আর একদিন হবে।" একে অধরমণি বাবুর পূর্ব্ব-দিনের ব্যবহারে সাতিশয় দুঃখিতা ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার এরূপ নিষেধ বাক্য। তাঁহার হৃদয় দারুণ অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি পরিচারিকাকে বাবুর নিকট হইতে উমেশ বাবুকে ডাকিতে বলিলেন। বাবু বুঝিলেন যে, ঐ ক্রোধ সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। তখন তিনি উমেশ

বাবুকে বলিলেন, "তুমি আর বাটীর ভিতর না যাইয়া দ্বারবানকে বলিয়া দাও যে, সে যেন বাটীর ভিতর যাইয়া বলে বাবুর বড় অসুখ হইয়াছে, তিনি নিদ্রা যাচ্চেন। আর উমেশ বাবুর হঠাৎ জ্বর হইয়াছে, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী গেলেন।" দ্বারবান্ বাটীতে এই কথা বলিলে, বুদ্ধিমতী অধরমণি বলিলেন, "এই যে উমেশ বাবু আমার নিকট আসিয়াছিলেন, এর মধ্যে কখন্ জ্বর হইল? আমার বোধ হয়, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দ্বারবান্ তুমি শীঘ্র তাঁহাকে বাটী থেকে ডাকিয়া আন।" এই বলিয়া তিনি মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে দুই একটী লোকের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লক্ষ্মণচন্দ্র দাস নামক একব্যক্তি ইহাঁদের বাটীর অন্যতম কর্ম্মচারী ছিল। তাহার উপর অতিথি বিদায়ের চাউল ও পয়সার ভার ন্যস্ত ছিল। সে অন্যান্য দিনের ন্যায় ঐ দিবসও সমাগত অতিথিদিগকে চাউল ও পয়সা দিতেছিল। তন্মধ্যে একটী অতিথি বলিলেন, "বাপু! আমার নিকট গুটিকতক ঠাকুর আছেন; তাঁহাদের

ভোগের পয়সা দাও। লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া বলিল, আমার উপর ঠাকুরের পয়সা দিবার হুকুম নাই। এইরূপ বাক্যপরম্পরায় ক্রমশঃ গোল হইতে লাগিল। বাবু এই গোল শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন ও অতিথিকে পয়সা দিতে বলিয়া ঠাকুর দেখিতে চাহিলেন। অতিথি অনেক গুলি ঠাকুর দেখাইলেন। তন্মধ্যে একটী ঠাকুর তাঁহার মনোমত হইল। তিনি সেটীকে লইয়া ৺গৌরাচাঁদ শিরোমণির দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইলেন। এই সময় তাঁহাদের কুলপুরোহিত আন্দুল নিবাসী ৺অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোলাপ-বাগানের ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাবুর নিকট হইতে ঠাকুরটী লইয়া বলিলেন, "ঠাকুর বাছিয়া লওয়া অতি বিচক্ষণতার কার্য্য; বিশেষতঃ কোন্ বংশে কোন্ ঠাকুর অনুকূল হন, তাহাও দেখিতে হয়। নতুবা হঠাৎ গ্রহণ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে।" বাবু এই কথা শুনিয়া ঠাকুরটী প্রত্যর্পণ করিলেন। অতিথি ঠাকুর লইয়া মহীয়াড়ি নিবাসী বাবু যদুনাথ কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে অধরমণি শুনিলেন যে, বাহিরে একটী অতিথি ঠাকুর আনিয়াছেন ও বাবু তাহা লইবার জন্য বাছিতেছেন। তিনি এই কথা শুনিয়া যার-পরনাই আনন্দিত হইলেন এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সফল হওয়ায় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মনে মনে সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন—"বোধ হয়, এতদিনের পর আমাদের উপর ভগবানের দয়া হইয়া থাকিবে; নতুবা হঠাৎ এরূপ স্বপ্ন দেখিব কেন?" বস্তুতঃ আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে এখনও স্ত্রীলোকদিগেরই মধ্যে ধর্ম্মপ্রবণতা বিশেষ-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, যদি কিছু পবিত্রতা, ভক্তিভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও যথার্থ অমায়িকতা থাকে, তাহা স্ত্রীহৃদয়েই আছে। বিশেষতঃ মহোদয়া অধরমণি স্বভাবতই ধর্ম্মশীলা ও ভক্তিপ্রবণহৃদয়া ছিলেন। যাহা হউক, এই সকল ঘটনায় তিনি এতদূর অন্যমনস্ক হইয়া-ছিলেন যে, গঙ্গাস্নানে যাইবার কথা একে-বারেই ভুলিয়া গেলেন। এইরূপ আনন্দের সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ঠাকুর

লওয়া হয় নাই, অতিথি চলিয়া গিয়াছে।” অধর-মণি এই কথা শুনিবামাত্র একেবারে উন্মত্তার ন্যায় বলিয়া উঠিলেন যে, “আজ যদি ঠাকুর লওয়া না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। যেখানে অতিথি গিয়াছেন, সেইখান হইতে যেন ঠাকুর আনীত হয়।” অগত্যা বাবু অতিথির অনুসন্ধানার্থে চারিদিকে লোক পাঠা-ইয়া ছিলেন। তখন উল্লিখিত যদুবাবু যোগেন্দ্র বাবুর নির্দ্দিষ্ট ঠাকুরটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণদ্বারা পরীক্ষা করাইয়া মূল্য নিরূপণ করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার লোক গিয়া ঠাকুরের কথা বলিলেন। সুতরাং যদু বাবু নিজে তাহা ক্রয় না করিয়া দুই শত টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক যোগেন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইলেন। বাবু স্বয়ং ঠাকুরটীকে অতিযত্নে গ্রহণ করিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইলেন। অধরমণি ঠাকুর দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিতা হইলেন এবং সেই আনন্দে তিনি স্বামীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। যোগেন্দ্র বাবুও স্বপ্নটী সত্যে পরিণত হইতে

দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ইহার চারিদিন পরে অর্থাৎ ১২৮০ সালের কার্ত্তিকী সংক্রান্তিতে বহুল সমারোহের সহিত উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা হইল। এই বিগ্রহপ্রতিষ্টা দ্বারা কেবল যে দেবপ্রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের উপকারের উপায় সংস্থাপন হেতু তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইয়াছে। জগতে কোন্ কার্য্য কি ফল প্রসব করিয়া থাকে, তাহা সহজে নির্ণয় করা সুকঠিন। মনুষ্যচক্ষে যে কার্য্য অতিশয় ঘৃণ্য ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, হয়ত তাহার পরিণাম ফল স্বর্গলোকবাসী দেবতাদিগেরও স্পৃহণীয় হইয়া থাকে। যোগেন্দ্রনাথের সুরাপানের পরিণামে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হইল!

নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করাই, মানব জীবন গঠনের একমাত্র উপায়। ইহা দ্বারা মানবহৃদয় কাপুরুষোচিত নীচতাপরিমুক্ত হইয়া অনিন্দনীয় পৌরুষ-ভূষণে ভূষিত হয়; মনোমধ্যে তাড়িৎশক্তি

সঞ্চারিত হইয়া মহত্ত্বের পথ নয়নপথে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু হায়! পুণ্যস্থান ভারতভূমির নামোচ্চারণ করিলে যে লুপ্তপ্রায় আর্য্য জাতির অতীত গৌরব মানসপটে সমুদিত হয়, আজ যদি সেই আর্য্য মহাপুরুষদিগের জীবন কাহিনী পাওয়া যাইত, তাহা হইলে এই ধূলিশয্যায় শায়িতা পর-পদদলিতা ভারতমাতা অত্যল্পকাল মধ্যে পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিতা হইতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতমাতার প্রিয় সন্তানেরা কবিতার কলকণ্ঠনাদেই মোহিত থাকিতেন; তাঁহাদিগের চিত্ত সহজে অন্য কোন দিকেই পরিচালিত হইত না। যদিও শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি সাধু পুরুষদিগের জীবন গাথা প্রচারিত আছে, কিন্তু সেই সকল,রূপক, উপন্যাস প্রভৃতির সহিত এরূপ জড়িত যে, তাহা হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করা দুরূহ। যাঁহারা সংসারক্ষেত্রে আহার বিহারে কালক্ষেপ না করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন; যাঁহারা বায়ুচালিত তৃণগুচ্ছের ন্যায় সংসারস্রোতের অনুকূল প্রবাহে পরিচালিত না

হইয়া, অনন্তকালের জন্য সংসার সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে স্ব স্ব পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্ত, কোন্ ব্যক্তির না হৃদয় উৎসুক হয়? তাঁহারা মধুময় বাল্যকালে কিরূপ খেলা খেলাইয়া লোকলোচনের তৃপ্তিসাধন করিতেন, যৌবনকালে সংসারে কি ভাবে বিচরণ করিতেন এবং জরাজীর্ণ অবস্থায়ও সংসারক্ষেত্রে কিরূপ উৎসাহ ঢালিয়া দিতেন; এ সমস্ত জানিবার নিমিত্ত মানবমাত্রেরই হৃদয় নাচিয়া উঠে। এই কারণেই আজ আমরা ভবিষ্যৎবংশীয়ের নিকট স্বদেশীয় রত্নসমূহকে চিরকাল সমভাবে জাজ্বল্যমান্ রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। যদিও ইহাঁরা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের নির্ব্বাচিত মহামূল্য রত্নের ন্যায় প্রভাশালী নহেন, তথাপি ইহাঁদের অনন্যসাধারণ উজ্জ্বলতা আমাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহকে স্নিগ্ধ জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা এ কালাবধি মহান্ হৃদয় যোগেন্দ্র-নাথের হৃদয় মন্দিরে, স্বর্গের অতুলনীয় পদার্থ

দাম্পত্যপ্রেমের অমৃতময় ভাবের বিন্দুমাত্র আভাস প্রদান করি নাই। মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ শ্রীমতী অধরমণিকে যেরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা আমাদিগের লেখনীতে প্রকাশ পাইবার উপযুক্ত নয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সমুদ্রের ,ভাবতরঙ্গ স্বরূপ প্রভাত-চিন্তায় যে প্রেমের স্বর্গীয় চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহাই এই দম্পতীর উপর সম্পূর্ণ আরোপ করিতে পারা যায়। আমরা তাহার আংশিক চিত্র এই স্থানে আলিখিত করিলাম। "উহাতে দয়ার আর্দ্রতা আছে, উপেক্ষা নাই; কামাদি সংযোজনী বৃত্তির প্রবল বেগবত্তা আছে, আবিলতা নাই; কৃতজ্ঞতার নম্রতা আছে, নীরসতা নাই এবং অন্যোন্য স্তাবকতার দাস আছে, প্রতিগ্রহ নাই। ফলাফল বিবেচনা, ক্ষতিলাভ গণনা এবং ভূত ভবিষ্যদ্ভাবনা উহার জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল সান্নিধ্যে কখনও পৌঁছিতে পারে না। যে ভাল বাসে, তাহার চক্ষে অদ্য আর কল্য কি? ভাল আর মন্দ কি? সুখ দুঃখই বা কি? ভাল বাসিয়া কি কেহ কোন দিন সুখী হইয়াছে? না

ভাল বাসিয়া কেহ কোন দিন প্রতিরোমপ্রসূত দুর্ব্বিষহ দুঃখকেও দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে? যখন মহাত্মা ভবভূতি সীতাস্পর্শমুগ্ধ প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্রের মুখে বলিয়াছিলেন যে,* 'এ আমার কি হইল, এ কি আমি সুখানুভব করিতেছি, না দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছি, এ কি আমি জাগ্রত রহিয়াছি, না নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, এ কি আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, না মদ-ধারা প্রবাহিত হইতেছে,' তখন তিনি বুঝিয়া-ছিলেন যে প্রেম কি। যেমন মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে প্রতিভাময়ী ক্ষণপ্রভার, ক্ষণিক চমক, তেমন মোহাচ্ছন্ন মনুষ্যমনে প্রীতির প্রাণগত রসস্বরূপ প্রকৃত ভালবাসার ক্ষণিক বিকাশ। উহা যাহার হৃদয়ে যতক্ষণ থাকে, সে অন্ততঃ ততক্ষণের জন্য দেবত্ব পায়, ততক্ষণ দিব্য রূপ দর্শন করে এবং জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ততক্ষণ

* "বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ রহে।” এইরূপ স্বর্গীয় প্রেম যোগেন্দ্রনাথ ও অধরমণির মধ্যে সম্যক্‌রূপেই প্রতিভাত হইত। যোগেন্দ্রনাথ ধনাঢ্য জমিদারপুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার করতলগত; ইচ্ছা করিলে তিনি আপনাকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইতে পারিতেন। কিন্তু এই দুইটী হৃদয় একটী সুদৃঢ় প্রেমসূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন দৈব-প্রতিকূলতাবশতঃ অধরমণির সন্তানোৎপত্তি হইল না, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই দারান্তর গ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে সেরূপ কার্য্যের প্রতি বিশেষরূপ ঘৃণা ছিল। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রীতি বিরাজ করিত, তাহা কখনও দুই বিভাগে বিভক্ত হইবার নয়। এই কারণে স্ত্রীরত্নের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়া পুত্রকামনায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভবপর হইয়াছিল। যখন যোগেন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃবিয়োগ হেতু সংসারে আত্ম-হারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি অধরমণির একমাত্র যত্নে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার কোনও পারিষদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে জানিতে

পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পত্নীসম্বন্ধে একবার গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "তিনি আমার কেবল স্ত্রী নহেন, তিনি আমার সমস্ত।"

অধরমণি যোগেন্দ্রনাথের "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" এইরূপ আত্মসমর্পণই যথার্থ ভালবাসা। আমরা শোকপ্রপীড়িতা অধরমণির নিকট জীবনীসূত্রে অনেকবার সম্মুখস্থ হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, পতিগতপ্রাণা অধরমণি এখনও নিয়তই স্বামীচিন্তাতেই ব্যাকুলা। স্বামী বর্ত্তমানে, কিসে স্বামী ভাল থাকিবেন, কিসে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি প্রফুল্ল থাকিবে, ইহাই তাঁহার একমাত্র ধ্যান ছিল। স্বামীর সুখের জন্য আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না। বাড়ীতে দাস দাসীর অভাব ছিল না, তথাপি পাছে স্বামী ও দেবরের কোনরূপ কষ্ট হয়, এই ভয়ে সামান্য গৃহস্থের পরিবারের ন্যায় স্বয়ং তাঁহাদের আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী ও স্বামী-ভক্তি দেখিয়া মনোমধ্যে

দিগ্বিজয়ী অর্জ্জুন ও নাগরাজকন্যা "উলূপীর" প্রণয় বৃত্তান্ত উদিত হইয়া থাকে। যখন মহাবল অর্জ্জুন নাগরাজকন্যা উলূপীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, তখন সতী স্ত্রী উলূপী তাঁহার নিকট হইতে আর কিছু প্রার্থনা না করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে কেবল মাত্র অর্জ্জুনের মঙ্গলামঙ্গল জানিবার উপায় প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন পতিগতপ্রাণার গৃহচত্বরে একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন যে, "যতদিন এই বৃক্ষটী জীবিত থাকিবে, ততদিন আমিও কুশলে থাকিব।" সেই অবধি সাধ্বী উলূপী অহরহ ঐ দাড়িম্ব বৃক্ষে জলসেক করিতেন ও প্রতিক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামী-বিরহ-জনিত দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিতেন। পতিবিয়োগবিধুরা অধরমণিও সেইরূপ স্বামীদেবতার স্মরণে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছেন। ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে উভয়ে উভয়ের সাহায্যে নিযুক্ত থাকিতেন, নিম্নে সেই সম্বন্ধে একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

এই সময়ে হরিদ্বারে "পূর্ণকুম্ভের" মেলা উপস্থিত হইয়াছিল। যোগেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর

মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমিত্ত আসিয়া অধরমণিকে বলিলেন যে, "এই সময়ে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের মেলা বসিবে। এরূপ মেলা শীঘ্র হয় না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। আমাদের জীবনে যে পুনরায় এরূপ যোগ ঘটিবে, তাহা বিবেচনা হয় না। এই মেলা উপলক্ষে সেই স্থানে বহু সম্প্রদায়ের লোক ও সাধু সমূহের সমাগম হইয়া থাকে। নানা দিক্‌দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া বহুবিধ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এখান হইতে দুই একটী যাত্রীও যাইবে। এই সময়ে যাইবারও অনেক সুবিধা আছে।"

পুণ্যবতী অধরমণি এই কথা শুনিয়া যাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিলেন এবং স্বামীর নিকটে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমি চৈত্র মাসের গরমে বাহির হইতে পারিব না।" সুতরাং পতিহিতৈষিণী অধরমণি ভগ্নমনোরথ হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। যোগেন্দ্র বাবু পুনরায় রাত্রে আহার করিবার সময় হরিদ্বার

সম্বন্ধে অনেক গল্প করিলেন। এই সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণের উপযোগিতা কি, কেনই বা লোকে তীর্থ ভ্রমণ করে, এই হরিদ্বার তীর্থের মহিমা কি, এই সম্বন্ধে অনেক কথাই বুঝাইয়াছিলেন। তখন অধরমণি বলিলেন, "যদি আপনি নিতান্তই যাইতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে লোক সহিত পাঠাইয়া দিন।" বাবু শুনিয়া বলিলেন, "এমন বিশ্বাসী লোক কে আছে যে তোমাদিগকে বিদেশে লইয়া নিরাপদে রাখিতে পারিবে?" অধরমণি বলিলেন, "আমি যদি এমন বিশ্বাসী লোক পাই, তবে আপনি পাঠাইয়া দিবেন ত?" বাবু তাহাতে সম্মত হইলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী মনস্কামনা সফল হইল বলিয়া, ঈশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং আদর্শ রমণী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, যদি কখন নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন ইঁহাকেই স্বামীরূপে প্রাপ্ত হই। যাহা হউক, অধরমণি বিশ্বাসী লোকের জন্য অত্যন্ত উতলা হইলেন। এমন সময়ে নগেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া কর্ত্রী

ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিলেন। অধরমণিও ইহাঁকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন ও অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো। রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্মণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য সমাধা হয় নাই; আমি তীর্থযাত্রা করতে ইচ্ছা করেছি, যাতে আমার যাওয়া হয়; তাহার কিছু সাহায্য করতে হবে। তোমাকে একটী বিশ্বাসী লোক অনুসন্ধান ক'রে দিতে হবে।" তাহাতে নগেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "দেখুন, অল্পদিন হইল আমরা মাতৃহীন হইয়াছি। আপনার উপর আমরা সমস্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। আপনিও যদি চলিয়া যান, তাহা হইলে আমরা অনাহারে মরিয়া যাইব। বিশেষতঃ এত বড় সংসারের যাবতীয় কার্য্য কে পরিদর্শন করিবে? আপনার কোন মতেই যাওয়া হইবে না। আমি কিছুই সাহায্য করিতে পারিব না।" অগত্যা অধরমণি নিরস্ত হইয়া রহিলেন ও মনে মনে বিশ্বাসী লোকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ ইহাঁর ভগিনীপতি

"খোলসিনী" নিবাসী বাবু দ্বারিকানাথ বসুর কথা মনোমধ্যে উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ এক-খানি পত্র লিখিয়া, তাঁহার নিকট একটী লোক পাঠাইলেন। অধরমণি তীর্থ ভ্রমণের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে, দ্বারিকানাথ বাবু পত্র পাঠে কোন বিপদ অনুমান করিয়া ত্বরায় আন্দুলে আগমন করেন। তিনি এখানে আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং সস্ত্রীক হরিদ্বার গমন করিতে মনস্থ করিয়া শুভ-দিন স্থির করণান্তর বাড়ী গমন করিলেন। পরদিন প্রাতে অধরমণি কয়েকজন ভৃত্য ও দেবর পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া "খোলসিনী" গমন করিলেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থানান্তর ভগিনী, ভগিনীপতি ও একটী ভাগিনেয়ী এই কয়েকজন একত্র হইয়া শুভ সময়ে হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। ইহাঁরা সর্ব্ব প্রথমে বৈদ্যনাথে উপ-স্থিত হইয়া ভগবান্ ভবানীপতির পূজা সমাপন পূর্ব্বক যানযোগে বাঁকিপুরে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে পবিত্রসলিলা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলন ভূমি পুণ্যপ্রদ প্রয়াগতীর্থ ও নানা সাহেবের

কেলিনিকেতন কানপুর অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হন। তথায় যথাসময়ে গঙ্গাস্নান, দীন দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে অন্ন ও অর্থদান পূর্ব্বক কয়েক দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় কানপুর পরিভ্রমণান্তর জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। পরদিন তথা হইতে শান্তিপ্রদ পুষ্কর যাত্রা করিলেন। তথায় শাস্ত্রানুযায়ী সকল কার্য্য সমাধা করিয়া, ভগবান্ কৃষ্ণের কেলিকানন যমুনাতীরস্থ মথুরা ও সূর্য্য-কুলপ্রদীপ ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা পরিভ্রমণান্তর পুনরায় জয়পুরে প্রত্যাগমন করি-লেন। তথায় ইহাঁদের বহুকালের অনুগত ও বিশ্বাসী পরিচারক দিগম্বর প্রামাণিক হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। উক্ত পরিচারকটী প্রায় বিংশতি বৎসর কাল মল্লিক সংসারে কার্য্য করিয়া, যোগেন্দ্র বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তথা হইতে অধরমণি মহাতীর্থ বারাণসী যাত্রা করি-লেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর আজমীঢ়, দিল্লী, আলিগড়, আজিমগড় প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান সকল প্রদক্ষিণ করিয়া আন্দুলে প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি বাড়ীতে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সংসারের সমস্ত কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। তীর্থভ্রমণজনিত শারীরিক ক্লান্তি এবং সংসারের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হওয়াতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, নগেন্দ্র বাবু ২৪ পরগণার অন্তর্গত "মজিলপুর" গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্তের কন্যা শ্রীমতী ত্রৈলোক্য মোহিনীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। অধরমণির পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি হওয়ায় যোগেন্দ্র বাবু ভ্রাতৃবধূর উপর সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ইহার পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে যে স্নেহবন্ধন ছিল, তাহা ক্রমে নানা কারণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল।

দশম অধ্যায়।

"সংসার" বিভাগ—যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

—ভবিষ্যতের গভীর গর্ভে দৃষ্টি সংযোজন করা মনুষ্যের অতীত। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সুন্দর শোভন রূপ অবলোকন করিয়া কে বলিবে যে, কালে ইহা ভীষণ শ্মশানে পর্য্যবসিত হইতে পারে। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। গৃহের আনন্দ-স্বরূপ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শিশুকে খেলিতে দেখিয়া যে হৃদয় মমতায় পূর্ণ হয়, সেই হৃদয় আসুরিকভাবের প্ররোচনায় সেই শিশু রক্তের শোণিতে হস্তরঞ্জিত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবসমূহের অভ্যন্তরে সেই মহান্ পুরুষের মহীয়সী ইচ্ছা নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে, তদ্বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। আজ আমরা যে মহাপুরুষের জীবনগাথা সাধারণের চক্ষুগোচর করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি; যাঁহার প্রীতিপ্রদ

দেবচরিত্র আলিখিত করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছি ; আজ তাঁহারই শেষদশা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছি। এক সময় যে বংশবৃক্ষের মহান্ শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া বহুলোককে সুশীতল ছায়া দানে তৃপ্ত করিয়াছিল ; যে বংশের বিমল জ্যোতিতে চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল এবং যে বংশের যশঃসৌরভে আন্দুল ও তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহ সুরভিময় হইয়া উঠিয়াছিল ; আজ সেই বংশের অবসন্নতা লিখিতে গিয়া লেখনী অবসন্নপ্রায় হইতেছে, হৃদয় শোকশল্যে বিদ্ধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া এমন উন্নত মল্লিকবংশ শ্রীভ্রষ্ট হইল এবং সেই সঙ্গে দেবপ্রকৃতি যোগেন্দ্রনাথের জীবনালোক কেমন করিয়া মহাকালে মিশাইয়া গেল, তাহাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। অদ্য যদি আমি ভগবতী সরস্বতীর প্রিয়পুত্র হইতাম, আজ যদি আমার হৃদয়ের ভাবসমূহ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিতাম, কিম্বা কোন অপরিজ্ঞাত দৈবশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের চিত্র

প্রতিফলিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই আলেখ্য জগজ্জনের তৃপ্তিসাধন করিতে সমর্থ হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যোগেন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে আন্দুলে পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, কি বৈষয়িক, কি সাংসারিক সকল কার্য্যই এরূপ বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন হইয়াছে যে, তাহা সংশোধন করিতে গেলে ভয়ানক গৃহবিবাদ সংঘটিত হওয়া সম্ভব। বিবেচক যোগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, যদি কোন খলস্বভাব ব্যক্তি একতর পক্ষকে কলহের অনুকূলে উৎসাহিত করে, তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধ হইবার বিলম্ব হইবে না। এই সকল ভাবিয়া তিনি স্বয়ংই নগেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিলেন; অবশেষে বলিলেন, "ভাই! তোমাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতেছি যে, তোমাদের ইচ্ছা যাহাতে পৃথক্‌ভাবে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আমারও এ বিষয়ে কোন অমত নাই। বর্ত্তমানকালে একান্নভুক্ত পরিবারবর্গ পরিণামে যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়,

পাছে আমাদিগেরও সেইরূপ নিন্দনীয় উদাহরণ স্থল হইতে হয়, এই কারণে আমি বলিতেছি যে, অদ্য হইতে সাংসারিক তাবৎ কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে নির্ব্বাহ হউক। কেবলমাত্র জমিদারী সম্বন্ধীয় বাহিরের কার্য্য অস্বতন্ত্র থাক্; সংগৃহীত অর্থ উভয়ে সমানাংশ করিয়া লইব।” নগেন্দ্র বাবুও এ বিষয়ে আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর না করিয়া, তাহার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেই অবধি এই মল্লিক বংশতরু দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে।

এই সংসার-বিভাগ-কার্য্যে বিচক্ষণবুদ্ধি যোগেন্দ্রনাথ বুদ্ধির সমীচীনতা, বৈষয়িক কার্য্যে নিপুণতা, অকৃত্রিম ভ্রাতৃপ্রেম, চরিত্রবলের উৎকর্ষতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়া সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যদি অর্থগৃধ্নু দুরাশয়দিগের কুমন্ত্রণায় প্রণোদিত হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ হয়ত ধ্বংসপ্রায় মল্লিক বংশের কোন্ প্রকার কীর্ত্তির অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হইত না।

এইরূপে আট দশ মাস গত হইলে আন্দোলের

ভাগ্যাকাশ সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এক দিবস যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কেমন একপ্রকার কষ্ট বোধ হইতেছে। শরীরে যেন কিছুমাত্র বল নাই, ইহার কারণ কি?" এই কথা শুনিয়া সকলেই চিন্তান্বিত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা দেহ পরীক্ষা করাইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাঁদের কেহ কিছুই বলিতে পারিলেন না। সুতরাং কলিকাতা হইতে গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়কে আনান হইল। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, ইহাঁর সমস্ত দেহে জল জমিয়াছে। ঈদৃশ উৎকট পীড়ার কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত ভাবিত হইলেন, এবং তাঁহার দ্বারা ঔষধ ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত করাইয়া তাঁহারই চিকিৎসাধীনে রাখিলেন।

এই ঘটনা সন ১২৯০ সালের কার্ত্তিক মাসে সংঘটিত হয়। কিছুদিন তিনি উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকিয়া পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইতে না দেখিয়া উপায়ান্তরের বন্দোবস্ত

করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা হইল যে, এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করান হয়। একারণ কলিকাতার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিচক্ষণ ডাক্তার কোট্‌স্ সাহেবকে আনান হয়। তিনি রীতিমত পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমতঃ ইহাঁর চিকিৎসায় রোগের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল বটে, কিন্তু পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে যোগেন্দ্রনাথ একমাস কাল ইহাঁর চিকিৎসায় থাকিয়া কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় কবিরাজী চিকিৎসা করাইবার মনস্থ করিলেন। এজন্য ১২৯০ সালের পৌষ মাসে কলিকাতা হইতে গোপীনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় আনীত হইলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়। কিছুতেই কিছু উপকার না হইয়া পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার অতুলনীয় দিব্যকান্তি যেন কোথায় লুক্কায়িত হইল। আর সেই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় বিমল হাসি শোভা পাইতে দেখা যাইতে লাগিল না। ক্রমে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইতে লাগিল।

শরীরমধ্যস্থ যন্ত্রসমূহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তৎকালীন কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার ও কবিরাজ আনীত হইয়া যিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তখনই তাঁহার সেই ব্যবস্থা অতি সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। অতি সাবধানী বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষাদি কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। মহিয়াড়ী নিবাসী ডাক্তার যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বাবধি বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপকারও পাইয়াছিলেন। একারণ যদু বাবু তাঁহার পীড়ার সূত্রপাত হইতে অতি আগ্রহের সহিত আপনার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রায় অহোরাত্র তাঁহার নিকটে থাকিতেন। যথাসময়ে ঔষধাদি দেওয়া, ডাক্তারদের নিকট রোগীর সাময়িক অবস্থার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। তিনি যে অর্থের প্রত্যাশী হইয়া ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহা নয়; যাহাতে দেশের একটী মূল্যবান্

জীবন রক্ষা পায়, ইহাই তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু হায়! কিছুতেই সেই দুরন্ত ব্যাধির উপশম হইল না। রোগ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাঁহাকে এযাত্রা গ্রাস করাই কালের উদ্দেশ্য। এই প্রকারে প্রায় ৫।৬ মাস কাল গত হইল। সকলেই এক প্রকার অবগত হইল যে, আর তাঁহার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যখন ক্রমাগত ৮।৯ মাস কাল সুবিখ্যাত ডাক্তারদিগের চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও কিছুতেই রোগের উপশম হইল না, তখন আন্দুলবাসী সকলেই তাঁহার ভাবী মৃত্যু স্মরণ করিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। যেন সকলেরই মুখে একখানি কালিমার ছায়া আসিয়া পতিত হইল। আত্মীয় স্বজনের অমঙ্গলে যেমন আত্মীয় ব্যক্তি নিপীড়িত হয়, সেইরূপ যোগেন্দ্র বাবুর নিমিত্ত আপামর সাধারণ সকলেরই চিত্তক্ষেত্র কাতর হইয়া পড়িল। তৎকালে দেশ মধ্যে এরূপ হইয়াছিল যে, দুই একটী স্বদেশবাসী একত্র হইলেই যোগেন্দ্র বাবুর কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা স্থান পাইত না।

ভবিষ্যৎদর্শী যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, এই পীড়া তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে অবলম্বন করিয়াছে এবং ইহা হইতে এ যাত্রা মুক্তিলাভ করিবার আশা নাই।

ইহার পর পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাঁকে আর এখানে না রাখিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়া উচিত। কলিকাতায় লইয়া গেলে চিকিৎসা আরও উত্তম-রূপে হইতে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমা-দের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই রোগের প্রতিবিধান হইবে।" যোগেন্দ্র বাবুর আত্মীয় স্বজন এইরূপ সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থির করিয়া স্বর্গের নন্দনকানন সদৃশ গোলাপ বাগানের শান্তিমন্দির শূন্য করিয়া ১২৯১ সালে ১৫ই আষাঢ় আন্দুলের উজ্জ্বলরত্ন জমিদার-কুল-ভূষণ মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

হায়! আজ কি অশুভক্ষণেই আন্দুলে প্রভাত-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। অন্য দিন যে সূর্য্যের চিত্তবিমুগ্ধকর জ্যোতিতে আন্দুলের আবাল-বৃদ্ধ-

বনিতার মুখকান্তি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িত, আজ সেই সূর্য্যের প্রভাত-কিরণে সকলের মুখচ্ছবি দুঃখপূর্ণ পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে বৈজয়ন্তধাম শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকার শোচনীয় দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল, সাধুহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ দুরন্ত ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে ভীত হইয়া কলিকাতায় গমন করায়, তাঁহার সাধের "গোলাপবাগান"ও সেইরূপ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল! সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এক আঘাতে প্রতিধ্বনিত! সকলেই আজ এক সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেই করুণাময়ের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মরণপূর্ব্বক পরস্পর একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশের প্রকৃত বন্ধু সাধুপ্রকৃতি যোগেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছিলেন; আন্দুলের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে হৃদয় যুগপৎ হর্ষবিষাদের আলয় হইত। আন্দুল-বাসী অধিকাংশ ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার

সহিত "বোটানিকেল গার্ডেন" পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার গুটিকতক অমৃতমাখা কথা শুনিয়া ও জন্মের মত তাঁহার দেবপ্রতিম সুন্দর মূর্ত্তির জীর্ণাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কলিকাতায় "নেবুবাগান" নামক স্থানে তাঁহার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত তদীয় পত্নী অধরমণি, পিতৃব্য কন্যা শ্রীমতী প্রমথমোহিনী দাসী ও অপর একটী আত্মীয় কায়স্থ কন্যা এবং আন্দুলের ৫।৭টী বিজ্ঞ অনুগত বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসা হইতে লাগিল। যোগেন্দ্র বাবুকে কলিকাতায় আনান হইয়াছে শুনিয়া ইহাঁদের আত্মীয় কলিকাতা নিবাসী ৺দুর্গাচরণ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেশচন্দ্র দত্ত ও ইহাঁর মধ্যম ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দে, ইহাঁরা দেখিতে আসিলেন। এই সময়ে উক্ত নরেশ বাবু ও নরেন্দ্র বাবু উভয়েই তাঁহার যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, অনেক সময় পুত্রের দ্বারাও তদ্রূপ উপ-

কার, হয় না। উহাঁরা সর্ব্বদাই যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে থাকিতেন ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার শান্তি সম্পাদন করিতেন। যোগেন্দ্র বাবুর পরিবারগণের ও তাঁহার সঙ্গীগণের কলিকাতায় যতদিন থাকিতে হইয়াছিল, ততদিন নরেশ বাবু তাঁহার নিজের বাটীতে সকলেরই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে অর্থের অসদ্ভাব হইলেও তিনি তাহা পূরণ করিয়া যথোচিত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বাবুও যোগেন্দ্রনাথের প্রতি পিতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন ও তৎকালোচিত সেবাশুশ্রূষা করিয়া যথোচিত প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যোগেন্দ্রনাথের একটী গুরুতর সম্বন্ধ ছিল বলিয়া যে তিনি এরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহা নহে। লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায়, অসময়ে লোকের সাহায্য করা তাঁহার চরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য সদ্‌গুণেও বঞ্চিত ছিলেন না।

এখানে এইরূপে ৮।১০ দিন কাটিয়া গেল। রোগী দিন দিন আরও অধিক অবসন্ন হইতে

লাগিলেন। এজন্য সকলেই স্থির করিলেন যে, কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ করিয়া "হোমিও-প্যাথিক" মতে চিকিৎসা করান হউক। অনেক-দিন একপ্রকার চিকিৎসা করিবার পর চিকিৎসার পরিবর্ত্তন হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সুবিখ্যাত ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার আনীত হইলেন। তিনি অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রোগের প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই চিকিৎসা পাঁচ দিন মাত্র হইয়াছিল। তৎপরে পুনরায় চিকিৎসার পরিবর্ত্তন হইল। এই সময়ে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হওয়াতে আন্দুলের অনেকানেক ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। সকলেরই সহিত তিনি সাধ্যমত আলাপ করিতে ক্রটি করিতেন না। শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যদি কাহারও সহিত কথা কহিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বারা কত দুঃখই প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রতি-ষ্ঠিত আন্দুল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু

বনয়ারীলাল বসু তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। পীড়াকালীন তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইতেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, হতভাগ্য আন্দুলের ভাগ্যাকাশ হইতে সে রত্নটীও অসময়ে বিলুপ্ত হইয়াছে। অনন্তরামপুরের মিত্রেরা ইহাঁদের নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঐ বংশের মাতৃ-পিতৃহীন বালক সুরেন্দ্রনাথ বড় বাবুর অসীমস্নেহে প্রতিপালিত হইয়া উক্ত মল্লিক সংসারে কার্য্য করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে রাজারাম যেমন পুত্রস্থানীয় ছিলেন, যোগেন্দ্র বাবুর পক্ষে সুরেন্দ্রনাথও সেই-রূপ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন।

আজ ১২৯১ সাল ১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার। এই মঙ্গলবার যোগেন্দ্রনাথের জন্মবার হইয়া আন্দুলের পক্ষে কত মঙ্গল বর্ষণ করিয়াছে। আজ আবার সেই মঙ্গলবার কি 'লোমহর্ষণ' ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে।

অহো! আজ কিরূপে লেখনী পরিচালন করি! সেই নিদারুণ লোমহর্ষণকর সর্ব্বনাশের

কথা কেমন করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইব। আর যে লেখনীকে চালিত করিতে পারি না। সপ্তাহকাল পূর্ব্বে যাঁহার সুধাময় বচনমাধুরীতে অভাগিনী পত্নী ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে আশা জন্মিয়াছিল, আজ আর তাঁহার হৃদয়কে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মঙ্গলামঙ্গল, স্বদেশের উন্নতি অবনতি, বিপন্নের সকরুণ আর্ত্তনাদ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধুর সম্ভাষণ কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিতেছে না। আজ তাঁহার আত্মা নির্মুক্ত-হৃদয়ে হরিনামামৃত পানে মাতোয়ারা; আজ তাঁহার আত্মা অক্লিষ্ট বিহঙ্গমের ন্যায় অনন্তালোকে উড্ডীয়মান হইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত। ১২৯১ সাল ১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার কাল কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ৫২ বৎসর বয়সে দয়ালহৃদয় যোগেন্দ্রনাথ সকল চিন্তা সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া প্রশান্তভাবে পরমানন্দ সহকারে অমরলোকে যাত্রা করিলেন। আন্দুলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অনন্ত কালের জন্য কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িল।

শোক-কাতর নগেন্দ্র বাবু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে যথাসময়ে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক

কার্য্য সমাধা করিলেন। পতিবিয়োগবিধুরা অধরমণির বিষয় আর কি লিখিব। জগতে এমন কোন কথার সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা প্রকাশ করিতে পারা যায়। তিনি তৎপর দিবস সধবাচিহ্ন সকল জন্মের মত উন্মোচন পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্যহৃদয়ে অন্ধকারময় আন্দুলের শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিলেন।

পরিশিষ্ট।

যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে শোকগীতি।

"মহীয়াড়ী উন্নতি-বিধায়িনী সভার" সভ্যগণ সন ১২৯১ সালে
২৭এ শ্রাবণ যোগেন্দ্র বাবুর মৃত্যু উপলক্ষে এক সভা
আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত পদ্যটী তাঁহার
সহধর্ম্মিণীর নিকট প্রেরণ করেন।

প্রকৃতি আঁধার সকলি নীরব,
আকাশ হইতে খসিল তারা;
সব আশাস্থল বন্যা-জলময়
কাঁদিছে বিধবা পাগল পারা!

যোগেন্দ্র গিয়াছে যোগেন্দ্র সমীপে
ডুবায়ে সাগরে আত্মীয় জায়া;
চিতার অনলে ভস্ম হ'য়ে গেছে
দিব্য কান্তি সেই সুন্দর কায়া।

রেখে গেছে কি সে পৃথিবী মাঝারে,
তাই নিয়ে সব পাখীরা গায়;

অন্তর ভিতরে নীরব আছিল
কেঁদে কেঁদে শেষে উড়িয়া যায়।

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননী,
জীবন সন্ধ্যায় আদেশে তাঁর
গিয়াছেন চলি স্বকার্য্য সাধিয়ে,
রাখিয়া কেবল শোকের ভার।

তাঁরি গুণে মোরা কত উপকৃত,
আকাশ হ'তে আদেশ প্রবল
আসিতেছে ওই "যারে তোরা সব
অনাথা মাতার মুছাতে জল।"

যোগেন্দ্র মোদের গিয়াছেন ছাড়ি
কার কথা শুনি কাঁদ হে ভাই,
একটী যোগেন্দ্র ছিল হে তোমার
যোগেন্দ্র এবে সব ঠাঁই ঠাঁই।

"আন্দুল আত্মোন্নতি সভার" উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক
স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে গভীর শোক
প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার শোকাকুলা পত্নী শ্রীমতী
অদ্বরমণির নিকট নিম্নলিখিত পদ্যটী
প্রেরণ করেন।

একি অসম্ভব কথা হৃদয়-শোষণ।
"যোগেন্দ্র" জীবনহীন সত্য না স্বপন॥
আন্দুলের ঘরে ঘরে
সবে মিলি সমস্বরে
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি করিছে রোদন।
আকুল-হৃদয়ে হৃদি করিছে পীড়ন॥

যোগেন্দ্রসম যোগেন্দ্র বিবেকিতাময়।
সংসারের প্রলোভনে কভু মুগ্ধ নয়॥
এমন সুন্দর নিধি
কেনরে নিঠুর বিধি
হ'রে নিলি হৃদে মারি দারুণ আঘাত।
অকারণে কে করিল এমন সম্পাত॥

ছিলেন নিয়ত যিনি মঙ্গলেতে রত।
অনাথের প্রতি দয়া যাঁর সদাব্রত॥

তবে আজ কি কারণে
বঞ্চিলে এমন ধনে
অমরপ্রতিম যিনি দয়া-অবতার।
সুগ্রহ, কুগ্রহ অহো! একি অবিচার!!

অয়ি মাতঃ ভাগীরথি! শিব-সীমন্তিনী!
পতিতপাবনী তুমি ভারতে গো শুনি॥
দুর্ব্বহ পাপের ভার
বহিতে না পারি আর
ল'য়েছ কি সঙ্গে করি অমল জীবনে,
বহিতে সমল আত্মা বিভুসন্নিধানে॥

গিরিশ্রেষ্ঠ শুভ্রশিরা দেব হিমাচল!
ধ'রেছ কি হৃদে তব যোগেন্দ্র অমল?
দেবগণ সম তাঁর
হেরি সদা ব্যবহার
তুমি কি রেখেছ সেই অমূল্য রতন?
তোমা পানে যেত সদা যাঁর দুনয়ন॥

শুন গো জননি! তুমি দেবী সরস্বতী!
দেখেছ কি কোন স্থানে যোগেন্দ্র-মূরতি॥

নাহি দেখি সমতুল
হেরি সদা অপ্রতুল
হিংসা বশে রাহু আসি করিল কি গ্রাস।
কিম্বা কোথায় সে আছে জান কি আভাস॥

শুন গো যামিনি দেবি মিনতি আমার।
কলঙ্কিত চন্দ্র ধরি হৃদয় মাঝার॥
লজ্জায় মলিনা হ'য়ে
কেড়ে নিলে আগাইয়ে
বিমল আন্দুল-চন্দ্র মহত্ত্ব-আধার।
পূর্ণ হ'ল মনস্কাম এখন তোমার॥

অনাথ "গোলাপবাগ" ঋণী তব পদে।
করিল কি দোষ বল ও কমল-পদে॥
অর্থব্যয় করি হায়
পুষ্ট কৈলে যার কায়
কাঙ্গাল করিয়া তায় কর পলায়ন।
অভাবে তোমার দেখ করিছে রোদন॥

অযাচিত দানে তব আন্দুল ভিতরে,
হইত লালিত যারা অপত্য আদরে॥

দেখিয়া তাদের দুখ
ফাটিবে কাহার বুক
কাঁদিয়া অনাথ সব হইল বিকল।
চাহিবে তাদের মুখ কেবা আর বল ॥

যশের অক্ষয় কীর্ত্তি আন্দুল ইস্কুল।
হেথাকার ক্ষমতার মহিমার মূল ॥
সেই কীর্ত্তি রক্ষিবারে
তোমা বিনে কেবা পারে
বুদ্ধিযোগে যথাযথ করিতে রক্ষণে।
কা'রো প্রতি নাহি আশা তোমার বিহনে ॥

ছাত্রগণ দেখ দেব করে হাহা রব।
ভাবি স্নেহ সরলতা মমতাদি সব ॥
কঠিন করিয়া হৃদি
পুত্র স্নেহ অবসাদি
চলি গেলে কোন্ হেন বিজন প্রদেশ।
দয়ামায়া নাহি তব মমতার লেশ ?

দীনের শরণ প্রভু করুণানিধান।
পাপীর তারণ হরি জগত জীবন ॥

জ্ঞানের আকর তুমি
অনাথের নাথ তুমি
তব ধামে হয় যেন যোগেন্দ্রের বাস।
এই ভিক্ষা যাচি বিভু! পূরে যেন আশ ॥

কেঁদ না জননি আর কেঁদ না গো সতি!
কাঁদিয়া কি ফল বল নিয়তির গতি ॥
সকলি কালেতে যাবে
কিছু নাহি চির রবে
ধর্ম্মের অমোঘ গতি অক্ষয় রহিবে।
বিভুর নিয়ম এই সদাই জানিবে ॥

অবশেষে জননি গো শুন নিবেদন।
স্বামী-কীর্ত্তি রক্ষিবারে ভুল না কখন ॥
ধর্ম্মে সদা মতি ক'রে
হরিপদ হৃদে ধ'রে
সদা দিন সযতনে পাতিত করিবে।
দুর্জ্জয় শমন-ভয় দূরে চলে যাবে ॥

আন্দুলস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী
অশেষগুণালঙ্কৃত ৺বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহোদয়ের
পরলোক গমনে উক্ত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের
শোকগীত।

কি হইল! কি হইল! হায় হায় হায়!
উজ্জ্বল বিমল মণি হারা'ল কোথায়!
আঁধারি আঁন্দুলপুরী, দশদিক্ শূন্য করি,
কে হরিল সে রতনে অমূল অতুল,
করিয়া সবার মন শোকেতে আকুল?

আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সকলের মনে
জাগরূক সমভাবে যিনি নিজ গুণে!
সকলে চক্ষের জলে ভাসায়ে অকূলে ফেলে,
কোথা ল'য়ে গেলি তাঁরে কাল নিরদয়?
কাহারো ভাল কি তোর প্রাণে নাহি সয়?

জগতের হিত কাজে যে জন তৎপর,
তাহাকেই ল'য়ে যাস্ চকিতে সত্বর;
হইয়া জগৎকর্ত্তা, আপনিই হ'স্ হর্ত্তা,
এ কোন্ বিচার তোর, এ কোন্ ব্যভার?
যে জন রক্ষক, সেই ভক্ষক আবার!!

তেমন প্রকৃতি অতি সুদুর্লভ ভবে,
শত্রু মিত্র উদাসীনে সমভাব সবে—
পণ্ডিতে পণ্ডিত কথা, বন্ধুসনে যথা প্রথা,
যে যেমন তার সনে আলাপ তেমন ;
লভিত না অসন্তোষ কেহই কখন।

কখনো ক্রোধের ভাব সে মুখমণ্ডলে
কেহ নাহি দেখিয়াছে আহা এত কালে ;
সর্ব্বদা সহাস্য মুখ, (হায় ফেটে যায় বুক!)
আনন্দেই গেছে তাঁর সমস্ত জীবন ;
অসার সংসার কাজে দেন নাই মন।

হায় নাথ কোথা তুমি ? দেহ দরশন ;
অনাথের নাথ, দীন-বিপন্ন-শরণ,
ধর্ম্মের অপর কায়, দয়ার সাগর হায়,
ভক্তির আধার, গুণরাশির ভাণ্ডার ;
সে মূর্ত্তি নাহিক হায় এ জগতে আর!!

কোথা গেলে ওহে নাথ ছাড়িয়া সকলে,
দয়া মায়া বিসর্জ্জিয়া, একেবারে ভুলে ?

সবে হ'য়ে সুকাতর, কাঁদিতেছে নিরন্তর
একবার দেখা দিয়ে প্রিয় সম্ভাষণে
সান্ত্বনা করিবে এস নিজ পরিজনে।

কেমনে ভুলিব তব সে প্রিয় মূরতি,
সুধামাখা কথা, আর সরল প্রকৃতি ?
স্মরণ করিলে হায় পাষাণ ফাটিয়া যায়।
কি ছার অসার বল মানুষ-হৃদয়,
তব শোকানলে তাহে তপ্ত অতিশয়।

আমাদের কথা যদি না কর শ্রবণ,
ভাই তব শোকানলে তাপিত জীবন ;
চিরকাল শিরে যাঁর অর্পিয়া সকল ভার,
আমোদ প্রমোদে সুখে করিলে যাপন,
সে ভাই বিষণ্ণ, তাহে ক্ষুণ্ণ নয় মন ?

বিধবা বনিতা তব পাগলিনী প্রায়,
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা শায়িত ধরায় ;
এক মনে এক ধ্যানে এক প্রাণে এক জ্ঞানে
(কাঁদিছে) ডাকিছে তোমা সতী পতিব্রতা ;
এসে তাঁরে বুঝাইয়ে যাও দুটা কথা।

সংসারের সার বস্তু সন্তান রতন,
তাহাতে বঞ্চিত তিনি (ভাগ্যের লিখন);
তোমার চরণে মন, করি চির সমর্পণ,
পরম সুখেতে যিনি যাপিতেন কাল,
হায় তাঁর ভালে কেন এরূপ জঞ্জাল!

জননি! কেঁদনা আর, কি হবে কাঁদিলে?
সংসারের রীতি এই—মরণ জন্মিলে,
সম্পদে বিপদচয়, মিলনে বিরহ হয়,
সুখে দুঃখ; বিধাতার এমনি লিখন,
কাহারই সাধ্য নাই করিতে খণ্ডন।

অবীরা ভেবে মা খিন্ন হ'য়ো না অন্তরে,
দুশত সন্তান দেখ মিলি একত্তরে,
হ'য়ে অতি হৃষ্ট মন, করিতেছে অধ্যয়ন,
তাহাদের হিতে রত থাক নিরন্তর,
তাহাদের 'মা মা' রবে জুড়াও অন্তর।

হ'তে পারে শেল সম স্বামীর নিধন;
কিন্তু মা বুঝিয়া দেখ কোথায় মরণ?
আছয়ে শাস্ত্রের উক্তি—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি,'

যে কীর্ত্তি রাখিয়া তিনি গেলেন এখন,
চিরজীবী-মাঝে তাঁর হইবে গণন।

স্বর্গধামে সুরগণ সাদরে তাঁহায়,
মন্দার কুসুমমালা পরা'য়ে গলায়,
মধুর-দুন্দুভিরব করি' মহা মহোৎসব,
জয় জয় কোলাহলে কোলাকুলি করি,'
বসাইয়াছেন দিব্য সিংহাসনোপরি।

মর্ত্ত্যসুখে কাটাইয়া কাল নিরন্তর,
এবে স্বর্গসুখে সুখী তাঁহার অন্তর ;
তাঁর তরে কেন তবে শোকেতে কাতর হবে ?
কেন মা তাঁহার সুখে ঘটাও ব্যাঘাত ?
স্বজন-শোকেতে লাগে মরমে আঘাত।

আর কি বলিব মা গো তুমি বুদ্ধিমতী,
সকলি বুঝিতে পার, প্রবলা নিয়তি ;
ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁয় কার্য্য মন্দ নয়,
যখন যা ঘটা'বেন তাই শুভ ভাবি,'
সংসারের কাজে মন কর অনুধাবি।

সম্প্রতি যোগেন্দ্রনাথের কোন এক বন্ধু কবি তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কবিতা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

"সুপ্তোঽস্ম্যহং কিমধুনা ননু জাগ্রদস্মি
মর্ত্ত্যে স্থিতোঽস্মি কিমহো ত্রিদশালয়ে বা।
স্বপ্নোঽথবায়ং কিমথ বা ভ্রমবিপ্রলাপো
মাং সত্যমেব কিমিদং ননু কশ্চিদাহ ॥১॥"

আমি এখন ঘুমাইয়া আছি না জাগিয়া আছি? আমি পৃথিবীতে আছি না স্বর্গে আছি? একি স্বপ্ন না ভ্রমে প্রলাপ দেখিতেছি? না সত্য সত্যই আমাকে কে এ কথা বলিতেছে?

"অত্রাবলোকয় সখে সুরদীর্ঘিকেয়ং
পূর্ণা প্রসন্নসলিলা প্রবহত্যজস্রম্।
ক্রীড়াপরামরবধূবদনানুকারি
পুজোপহারকমলাকলিতামলশ্রীঃ ॥২॥"

সখে, এই দেখ, মন্দাকিনী নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। দেবপত্নীগণ জলক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ও তদনুরূপ সুন্দর পূজার পদ্মসমূহে ইহা বিমল শোভা ধারণ করিতেছে।

"তীরে বিরাজতিতরামমরাবতীয়ং
নীরেহমলে নিপতিতপ্রতিবিম্বদীর্ঘা।
গন্ধর্ব্বকিন্নরগণামরসিদ্ধসাধ্য
সম্বাধসঙ্কুলপথা বহুহর্ম্ম্যরম্যা ॥৩॥"

ইহার তীরে এই অমরাবতী শোভা পাইতেছে। নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্ব পড়ায় উহা অত্যন্ত দীর্ঘ দেখাইতেছে। গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব সিদ্ধ ও সাধ্যগণে পথ সকল পরিপূর্ণ এবং বহুসংখ্য হর্ম্ম্যে উহা রমণীয় হইয়াছে।

"পুরঃ পুরোহস্য রমণীয়মুত্তমং
ফলপ্রবালাবৃতশাখিশোভিতম্।
সুজাতপুষ্পপ্রচয়াচিতং মনো-
হভিনন্দনং নন্দন নাম কাননম্ ॥৪॥"

ঐ নগরের সম্মুখে মানসতৃপ্তিকর ফল পল্লবে আবৃত তরুগণে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট পুষ্পসমূহে আকীর্ণ ঐ যে রমণীয় উত্তম উপবনটী দেখিতেছ, উহার নাম নন্দনকানন।

"বিয়ন্নদীবারিবিধৌতবিগ্রহ-
স্তথা চ মন্দাররজঃকণান্বিতঃ।
অনুক্ষণং বাতি মৃদুঃ সমীরণ-
শ্চিরং বসন্তোহত্র সমং বিরাজতে ॥৫॥"

সুরধুনীর জলে সিক্ত এবং মন্দার পুষ্পের পরাগে রক্তবর্ণ হইয়া মৃদু বায়ু অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে। ওখানে বসন্ত চিরদিনই সমভাবে বিরাজ করিতেছে।

"সুরদ্রুমূলেঽত্র সুরত্ননির্ম্মিতে
শুভাসনে যোঽয়মহো নরোত্তমঃ।
সুসেবতে যং সুররাজ শাসনাৎ
সদৈব বিদ্যাধরযোষিতাং গণঃ ॥৬॥"

"ক্ষিতৌ প্রসিদ্ধং পুরমান্দুলেতি
নামান্তিকে ভারতরাজধান্যাঃ।
তত্রাভবন্মল্লিকবংশহংসো
যোগেন্দ্রনাথো নররত্ন এষঃ ॥৭॥"

উহার মধ্যে কল্প-বৃক্ষমূলে রত্ননির্ম্মিত সুন্দর আসনে ঐ যে নরবর বসিয়া আছেন, যাঁহাকে দেবরাজের আদেশে বিদ্যাধর রমণীগণ সর্ব্বদা সেবা করিতেছে, ঐ নরবরের নাম যোগেন্দ্রনাথ। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার নিকটে আন্দুল নামে যে প্রসিদ্ধ নগর আছে, তথায় মল্লিকবংশের উনি প্রধান ছিলেন।

"শীলেন শৌচেন চ সূনৃতেন
বাক্যেন দাক্ষিণ্যগুণেন চৈব।

দানেন মানেন চ ধর্ম্ম কার্য্যৈঃ
স্ববালয়ং সাধু সমাগতোঽসৌ ॥৮॥"

উনি সচ্চরিত্রতা, পবিত্রতা, সত্য ও প্রিয় বচন, দাক্ষিণ্যগুণে, দানে, মানে ও ধর্ম্ম কার্য্যের ফলে সুখে স্বর্গপুরে আগমন করিয়াছেন।

"নিশম্যতাং নিত্য মিহাগতাঃ শুভাঃ
সুচারুবেশাঃ সুরবারযোষিতঃ।
সমৃত্যমেনং পরিতোঽলিগুঞ্জনৈঃ
সহাস্য গায়ন্তি গুণং পুনঃ পুনঃ ॥৯॥"

ঐ শুন, সুন্দরী সুবেশা অপ্সরারা সর্ব্বদা এখানে আগমন করিয়া চারিদিকে নৃত্য করতঃ ভ্রমর গুঞ্জনের সহিত পুনঃ পুনঃ উঁহার গুণগান করিতেছে।

পরিশিষ্ট। (২)

যোগেন্দ্র বাবুর কিরূপ ধর্ম্মভাব ছিল—তাঁহার কিরূপ সাধন, বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য, সদাচার, বিনয় ও কার্য্যোদ্যম ছিল; এই পরিশিষ্টে সেই সকল বিষয় কিছু কিছু বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

বিশ্বাস।

তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি গ্রন্থ ও কতিপয় সংস্কৃত পুস্তক আলোচনা করিয়া সত্যের বিমল জ্যোতিঃ অনুভব করিয়াছিলেন। সাধারণকে সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিরাম মন্দিরের আলোকাধারে "সত্যম্ বলম্ কেবলম্" এই নীতিময় কথাটী রক্তিমবর্ণে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নিয়ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহে অর্থাৎ পানের ডিপায়, বসিবার আসনে, হস্তের অঙ্গুরীতে, নানা সুনীতিব্যঞ্জক সংস্কৃত শ্লোক খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার হৃদয়নিহিত সত্যভাবকে তাহারা অনুক্ষণ সন্ধুক্ষিত করিতে

পারে। তিনি প্রথমাবধি "যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়" এইরূপ সত্য বিশ্বাসে অভ্যস্ত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

ভক্তি।

মহান্-হৃদয় যোগেন্দ্রনাথের ভক্তি সহসা সাধারণের নেত্রগোচর হইত না। তাঁহার ভক্তি অকৃত্রিম অন্তর্নিগূঢ় ছিল। অন্ধবিশ্বাস তাঁহার নির্ম্মল ভক্তিকে দূষিত করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতে হইলে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাহার একমাত্র উপায়। তিনি অন্তরের ধন; বাহিরের বস্তু তাঁহার প্রীতিসাধন করিতে পারে না। এই জন্যই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, দেশীয়গণের প্রতি অনুরাগ ও তাঁহাদের উন্নতিসাধন কল্পে প্রাণপণে চেষ্টা প্রভৃতিতে তাঁহার ঈশ্বর-ভক্তির পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরাম মন্দিরস্থ উদ্যানের প্রান্তভাগে একটী শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বিনয়।

যোগেন্দ্রনাথ একজন অতি নম্রপ্রকৃতি বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। রাজাধিরাজ হইতে সামান্য নীচ বংশোদ্ভব ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি সকলের প্রতিই তিনি যথোপযুক্ত নম্রভাব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাকে প্রায় কেহই ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কাহারো কোনও দোষ দেখিলে, তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেন যে, দোষী ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া স্বকৃত দোষের জন্য লজ্জিত হইত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মিলিত হইয়া যদি কোন অভাব জ্ঞাপন করিত, তিনিও তৎক্ষণাৎ সকল বিষয় বিশদরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগকে নানাবিধ নম্রবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। অসভ্যপ্রকৃতি ধাঙ্গড়গণ এক সময় তাঁহার বাগানের কোনও কার্য্যে আইসে, তাহারা একদিন যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যাইয়া "বাবু তুই খাবার দিবি না" প্রভৃতি বাক্যে তাঁহাকে সম্ভাষণ করে। তিনি সেই অবধি মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ডাকিয়া স্বহস্তে আহারীয় দ্রব্যাদি দিতেন ও তাহা

সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতেন।

ক্ষমা।

আমাদের যোগেন্দ্রনাথ ক্ষমাগুণের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ক্ষমাগুণের আতিশয্যে তাঁহার মূল্যবান্ জীবন সময়ে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে বর্ণনা করিয়াছি। সত্য যাঁহার সকল কার্য্যের ভিত্তি-ভূমি, বিবেক যাঁহার সহায়, সেই যোগেন্দ্রনাথ বিপদে পড়িলেও পরম ন্যায়বান্ ভগবানের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিলেন। আর একবার যোগেন্দ্র বাবুর এক অনুগত ভৃত্য কোন গুরুতর দোষে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হয়। পরিজনেরা সকলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলেন; যোগেন্দ্রনাথের উদারতা ও দয়াগুণে সে ভৃত্য সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সেই অবধি সেই ভৃত্য তাঁহার উপদেশমত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপন চরিত্রের যথোচিত পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রদান করেন।

দয়া।

যোগেন্দ্রনাথের দয়া স্থানীয় দরিদ্রব্যক্তি ও বিদ্যালয়ের ছাত্র সমূহের উপর অযাচিত ভাবে ব্যয়িত হইত। তিনি অর্থহীন বিপন্ন ভদ্র পরিবারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কত হীন অবস্থাপন্ন ছাত্র নিয়মিত আহার ও পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে স্বচ্ছন্দে বিদ্যালাভ করিত। সামান্য পল্লীগ্রাম মধ্যে এরূপ সুবিধা সচরাচর লক্ষিত হওয়া দুরূহ, কিন্তু দয়াল যোগেন্দ্রনাথের কৃপায় অন্দুলের সে অভাব টুকু অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছিল।

জ্ঞান।

যোগেন্দ্র বাবু বাল্যকাল হইতেই মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রভাবে কর্ম্ম কাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান মার্গের পথিক হইয়াছিলেন। অসার পুস্তক ও শূন্যগর্ভ সংবাদ পত্র তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। নীতিময় শ্লোক-সমূহ অদ্যাবধি তাঁহার রোজনামচায় বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ-জ্ঞানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইতিহাস, কাব্য, বিজ্ঞান আলোচনায় তাঁহার

জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানশক্তি মার্জ্জিত করিবার জন্য অধ্যয়ন করিতেন।

কার্য্যোদ্যম।

হাবড়া জিলার প্রসিদ্ধ জমীদার যোগেন্দ্র বাবুর জীবন যে আদর্শ-জীবন, একথা আমরা অম্লান-বদনে স্বীকার করি। তাঁহার উদ্যমে এবং আন্দুল নিবাসী কৃষ্ণ বাবুর যত্নে আন্দুল হিতকরী সভার অবতারণা হয়। সভার উদ্দেশ্যসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা যে সাধুকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা পাইলে দেশের অনেক অভাব এককালে দূরীভূত হইত। যোগেন্দ্র বাবুর আন্তরিক যত্নেই আন্দুল গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়; উহারই ফলে আন্দুলের অনেকে যে মনে প্রাণে পরিমার্জ্জিত হইয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। অদ্যাবধি বিদ্যালয়টী তাঁহার নামের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। দেশহিতকর কার্য্য-সমূহে তিনি জীবনের অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন।

সম্পূর্ণ।